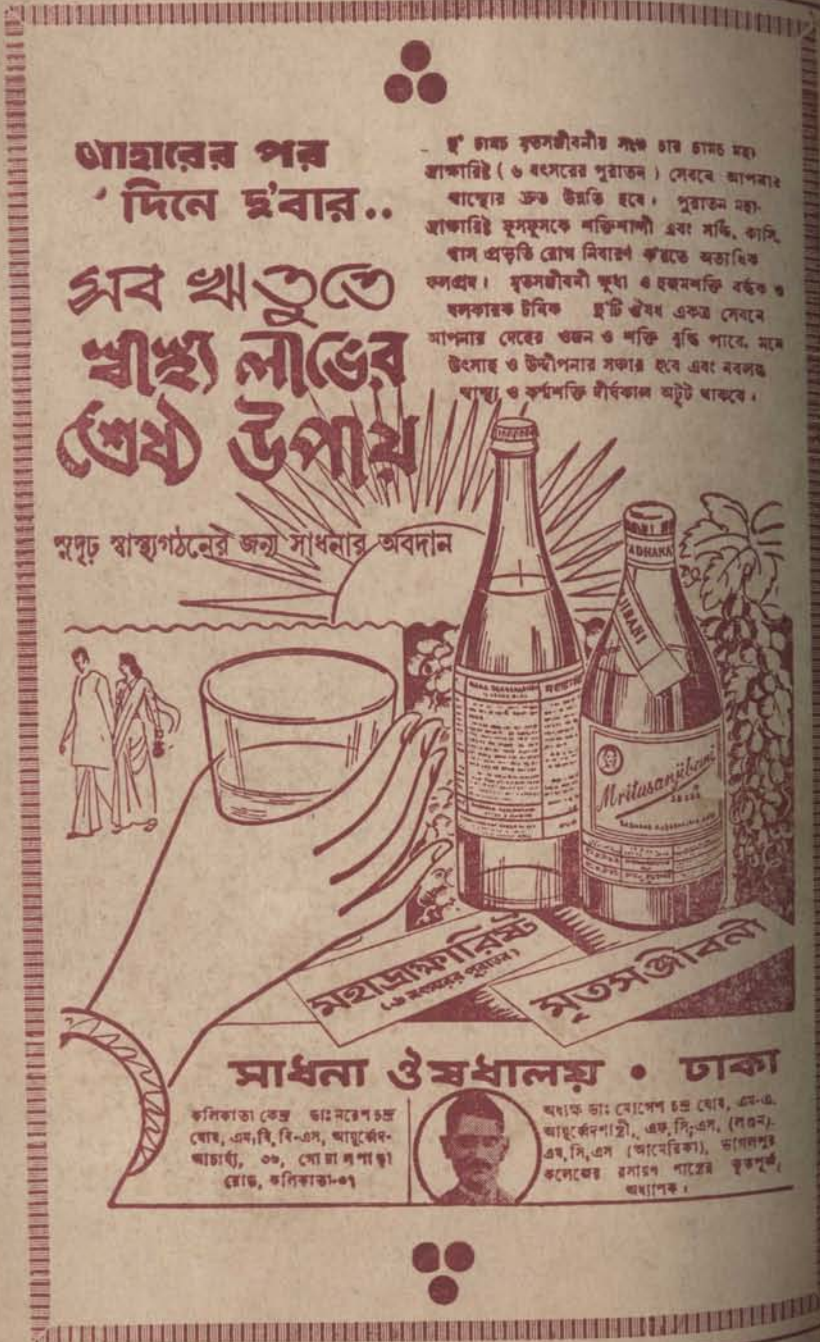


পরিচয়

পৌষ ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়



সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩১। সংখ্যা ৬
পৌষ, ১৮৮৩। ১৩৬৮

ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতার তাৎপর্য প্রসঙ্গে

অংশু দত্ত

৯ই ডিসেম্বর ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি আফ্রিকার রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি এবং বিশ্বরাজনীতিতে আফ্রিকার ভূমিকা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন নতুন করে চিন্তা করবার সুযোগ দিয়েছে। আমাদের নিম্নলিখিত আলোচনা তাই সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছাত্রের কাছে প্রাসঙ্গিক হবে, তাছাড়া ভারতবাসী হিসাবে আমাদের ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা তথা সমগ্র পূর্ব-আফ্রিকার রাজনীতির ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার বিশেষ প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এই বিশেষ প্রয়োজনটির কথা বলে আমাদের বক্তব্যের অবতারণা করা যাক। ট্যাঙ্গানাইকার ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে এই বিশেষ প্রয়োজনের স্বভাবসিদ্ধতা বোঝা যাবে। পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের মাঝামাঝি ট্যাঙ্গানাইকার সমুদ্রতীর, অনতিদূরে জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপ। যার ওপর সবচেয়ে বড় বন্দর হল দার-এস-সালাম। আরব সাগরে নৌবাহন করার পক্ষে এদের উপযোগিতা অপরিসীম। তার ওপর আছে আরব সাগরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নিয়মিত মৌসুমী বায়ু, যার কল্যাণে কোনো রকম যান্ত্রিক শক্তি ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র পালের ওপর নির্ভর করে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে আরব সাগর পাড়ি দিতে পারত। বহুদিন থেকে এমন নৌবাহন চলে আসছে। এবং কোনো কোনো পুরাণে পূর্ব-আফ্রিকার কিছু কিছু ভৌগোলিক উল্লেখও পাওয়া যায়। ভারত ও পূর্ব আফ্রিকার যোগাযোগ নিকটতর হয় এই উভয় অঞ্চল ইওরোপীয় অধিকারে আসার পর থেকে। ট্যাঙ্গানাইকা অবশ্য প্রথমে জার্মান উপনিবেশ ছিল। প্রথম

মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর এখানে বৃটেনের ম্যাণ্ডেট শাসন প্রবর্তিত হয়। সে যাই হোক বৃটিশ শাসনের তাগিদে বহু ভারতীয় এখানে আসে। এর মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল ব্যবসায়ী। কিন্তু তা ছাড়াও ছিল রেলপথ ও অন্য পরিবহন ব্যবস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী অফিসের নিম্ন ও মধ্যপদস্থ কর্মচারী। ফল হয়েছে এই : আজ সংখ্যার দিক থেকে এরা নেহাৎ নগণ্য নয় (১৯৪৮ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০-এরও বেশি), আর দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে (বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে) এদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে।[১] টাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা পাওয়ার পর এঁদের তীব্র আফ্রিকান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে সে কথা বলা বাহুল্য। এখনই অনেক অঞ্চলে আফ্রিকান সহযোগ ভারতীয় একচেটিয়া কারবারীদের কোনঠাসা করেছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর আফ্রিকার প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই বাড়বে। এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে থাকার ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হটিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা বর্ণ-সংঘর্ষের রূপ নেবে কি না। স্পষ্টই বোঝা যায়, সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। আশার কথা, পূর্ব আফ্রিকার অন্য দেশগুলির তুলনায় ট্যাঙ্গানাইকার বর্ণ-সম্পর্ক (অর্থাৎ আফ্রিকান-ভারতীয়-ইওরোপীয় সম্প্রদায়ত্রয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ) অনেক স্বাস্থ্যকর। কেনিয়ার মতো ট্যাঙ্গানাইকায় আফ্রিকান কোনো সমাজ এত শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়নি। কেনিয়ায় এসেছে বহু ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক। বিস্তৃত এলাকা তাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। ফলে অনেক আফ্রিকান উপজাতি জমিচ্যুত হয়ে অন্য উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ভিড় বাড়িয়েছে, ইওরোপীয় আবাদে অস্থায়ীভাবে বাস করেছে ; এবং কেউ কেউ শহরে ছিন্নমূল আফ্রিকানদের দলে এসে মিশেছে। আফ্রিকান বিক্ষোভ ও অশান্ত প্রতিবাদ, আফ্রিকান অগ্রগতিতে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সক্রিয় বাধাদান, ভারতীয়দের ত্রিশংকুর মতো অবস্থা, এই সমস্ত উপাদান কেনিয়ার বর্ণ-পরিস্থিতিকে জটিলতর করেছে। ট্যাঙ্গানাইকা বিশাল দেশ (পশ্চিমবঙ্গ,

১। শ্রীকোন্দোপির হিসাব অনুসারে এশীয়গণ (যাদের মধ্যে ভারতীয়রা সর্বাধিক) ট্যাঙ্গানাইকার আমদানী বাণিজ্যের ৫০% এবং রপ্তানী বাণিজ্যের ৬০% নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া, এদের কারো কারো হাতে আছে ছোটখাট বাগিচা ও কলকারখানা।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সমান হবে)। সেখানে উচ্চ মালভূমিতে কিছু কিছু ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক স্থায়ীভাবে বসবাস করছে সত্য কথা। কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় তা কিছুই নয়। এমনকি শুধুমাত্র সংখ্যার হিসাবেও কেনিয়ার ইওরোপীয় বাসিন্দারা ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় বাসিন্দাদের চেয়ে বেশি হবে। অতএব ট্যাঙ্গানাইকার রাজনীতিতে ইওরোপীয়রা আফ্রিকান-বিরোধী চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি।

এ ছাড়া ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় সমাজের পক্ষে কেনিয়ার ইওরোপীয় সমাজের মতো যূথবদ্ধ হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এখানে ছিল জার্মান প্রভুত্ব। এবং সরকারী আনুকুল্যে অনেক জার্মান ঔপনিবেশিক এদেশে বসবাস সুরু করে। ম্যাণ্ডেট শাসনে অবশ্য ইংরেজ নাগরিকেরা ট্যাঙ্গানাইকায় বসতি করতে আসে। কিন্তু কেনিয়ার মতো সুসংবদ্ধ ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় ট্যাঙ্গানাইকায় জন্ম নেয়নি।

এর সঙ্গে যোগ করতে হয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা। ট্যাঙ্গানাইকা প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশন্সের ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের অধীনে অছি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দ্বিবিধ ব্যবস্থায় যদিও শাসনক্ষমতা বৃটেনের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, তবু লীগ অফ নেশন্স ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দেশের শাসন, রাজনৈতিক প্রগতি ও বর্ণসম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে পর্যালোচনা ও উপদেশদানের অধিকার ছিল। আন্তর্জাতিক জনমতের সক্রিয় ভূমিকায় বৃটেনের পক্ষে ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের যথেচ্ছ সুযোগ-সুবিধা দান সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বর্ণবৈষম্য যে ছিল না তা নয়। সরকারী বেসরকারী অফিসে, বর্ণের ভিত্তিতে দক্ষিণার তারতম্য ছিল, হোটেল রেস্তোঁরা রেলস্টেশন প্রভৃতি সর্বজনগম্য স্থানে আফ্রিকানদের ইওরোপীয়দের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হত না। হাসপাতালে ইউরোপীয় রোগী এবং জেলখানায় ইউরোপীয় কয়েদীরা সুখসুবিধা পেত। এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৫২ সালে সরকারী স্কুলে গড়পড়তা আফ্রিকান ছাত্রের জন্য যা খরচ করা হয় ইওরোপীয় ছাত্রের জন্য খরচ করা হয় তার আটাশ গুণ বেশি টাকার। কিন্তু কেনিয়ার মতো এত চরম প্রভেদ, এমন অন্ধ আফ্রিকান বিদ্বেষের গোঁড়ামী ট্যাঙ্গানাইকায় জন্ম নিতে পারেনি।

এককথায়, এতকাল পর্যন্ত ট্যাঙ্গানাইকার বর্ণসম্পর্ক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ঈর্ষা দ্বেষ ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও,

প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়নি। এর পেছনে বিশ্বরাজনীতির প্রভাব ও আভ্যন্তরিক কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু ইদানীংকালে বোধহয় এর পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছে আফ্রিকান রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ট্যাঙ্গানাইকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নাম ট্যাঙ্গানাইকা আফ্রিকান জাতীয় ইউনিয়ন (ট্যাঙ্গানাইকা আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন, সংক্ষেপে টি. এ. এন. ইউ. বা 'টান্থ')। এর নেতার নাম শ্রীজুলিয়াশ নিয়েরেরে। শ্রীনিয়েরেরের নেতৃত্বে 'টান্থ' অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৫৪ সালে এর জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই সারাদেশে 'টান্থ'র শাখা-সংগঠন বিস্তৃত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ট্যাঙ্গানাইকার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 'টান্থ' সমস্ত আফ্রিকান আসন এবং বেশ কিছু এশীয় ও ইওরোপীয় আসন দখল করে। ১৯৬০ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে 'টান্থ'র সভ্য ও সমর্থকেরা ৭১টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসনে নির্বাচিত হন।

শুধুমাত্র আফ্রিকানরা এই দলের সভ্যপদ পেতে পারলেও একে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া উচিত হবে না। আগে বলা হয়েছে, এশীয় ও ইওরোপীয় আসনগুলিতেও 'টান্থ' সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের বহু নেতা শ্রীনিয়েরেরে তথা 'টান্থ'র নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। এঁদের পক্ষে এ কাজ সহজতর হয়েছে, কারণ 'টান্থ' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণ ও জাতি-আশ্রয়ী রাজনীতির নিন্দা করেছে। 'টান্থ'র শৈশবে জুলিয়াস নিয়েরেরে বলেন, ট্যাঙ্গানাইকার রাজনীতিতে জাতি বা বর্ণের স্থান নেই। অল্প কিছুদিন আগে যখন ট্যাঙ্গানাইকার বিধানসভায় নাগরিকতা-আইন আলোচিত হচ্ছিল, তখন কিছু কিছু চরমপন্থী আফ্রিকান সদস্য দাবি তোলেন যে, বর্ণের ভিত্তিতে ট্যাঙ্গানাইকার নাগরিকত্ব নির্ধারিত করা হোক। শ্রীনয়েরেরে এ দাবি খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করেন এই কথা বলে যে, দেশের প্রতি আনুগত্য ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা উচিত হবে না।

শ্রীনিয়েরেরে ও তাঁর সহযোগী নেতারা একাধিকবার বলেছেন স্বাধীন ট্যাঙ্গানাইকায় অনাফ্রিকান সম্প্রদায়সমূহের কোনো ভয়ের কারণ নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রগতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারতীয় ও ইওরোপীয় নেতারাও

মোটামুটি 'টান্থ'র সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। 'টান্থ'র সমর্থনে ভারতীয় ও ইওরোপীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচনে জয়লাভ এবং শ্রী নিয়েরেরের মন্ত্রিসভায় ভারতীয় ও ইওরোপীয় মন্ত্রিগণের অংশগ্রহণ এই সহযোগিতার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সহযোগকে স্থায়ী করতে হলে ভারতীয় ও ইওরোপীয়দের সমস্ত রকমের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার মোহ ছাড়তে হবে। এক স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রে সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো স্থান নেই, একথা অনাফ্রিকানরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারেন ততই মঙ্গল। একথা ঠিক যে অনাফ্রিকান নেতৃবৃন্দ আফ্রিকার নেতৃত্বের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা শুধু ওপরতলার নেতৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। সাধারণ ভারতীয় ও সাধারণ ইওরোপীয়কে নিজেদের ট্যাঙ্গানাইকার অধিবাসী বলে মনে করা দরকার। যে পরিমাণে তারা বৃহত্তর ট্যাঙ্গানাইকান সমাজের অংশীদার হতে চাইবে ও তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং যে পরিমাণে ট্যাঙ্গানাইকার আফ্রিকানরা অনাফ্রিকান সম্প্রদায়সমূহকে আত্মীকরণ করতে চাইবে ; সেই পরিমাণে ট্যাঙ্গানাইকার বর্ণসম্পর্ক উন্নত হবে। অবশ্য ব্যাপারটা লিখতে যত সহজ, কাজে তত অনায়াসসাধ্য নয়। বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর (বিশেষত যদি তাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনযাত্রার মানে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে) সমীকরণ এক জটিল ও বহুবিলম্বিত প্রক্রিয়া। হাজার বছর একসঙ্গে বাস করেও ইহুদী ও ইওরোপীয় খ্রীষ্টানরা একীভূত হয়নি। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পার্শীরা এসেছে ১২ শ বছর আগে, তবু তাদের পৃথক সত্তা এখনও যায়নি। অতএব, অন্তর্বিবাহ ইত্যাদির ফলে ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্বের অবসান অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে এমন আশা করার কোনো কারণ নেই। নাতিদূর ভবিষ্যতে যেটা সম্ভব সেটা হচ্ছে পৃথক সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব অস্বীকার না করে ট্যাঙ্গানাইকার সামগ্রিক স্বার্থে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ মিশিয়ে দেওয়া। ট্যাঙ্গানাইকার ভারতীয়গণ আপন স্বার্থে এই উদ্দেশ্যে কাজ করবেন এমন আশা আমরা ভারতবর্ষ থেকে করতে পারি। ভারত সরকার আর একবার ট্যাঙ্গানাইকার ভারতীয়দের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে পারেন ইতিপূর্বে শ্রীনেহেরু সাধারণভাবে আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দের তা বলেছেন)

যে তাদের নিজদের ট্যাঙ্গানাইকার মানুষ বলে মনে করতে হবে এবং স্বকীয় পরিশ্রম, উদারতা ও অনসূয়া দিয়ে আফ্রিকানদের সম্প্রীতি জয় করতে হবে।

স্পষ্টত ট্যাঙ্গানাইকায় যদি আফ্রিকা-ভারতীয় সম্পর্ক পারস্পরিক প্রীতি ও বিবেচনার ভিত্তিতে সুসংগঠিত হতে পারে, তবে পূর্ব আফ্রিকার অন্যত্র প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা সহজতর হবে। পক্ষান্তরে যদি তা না হয় এবং যদি বর্ণসংঘর্ষে সেখানকার ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ভারতবর্ষ এক দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হবে। সংখ্যাল্পতার সুযোগ নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার করা হলে তাদের সমর্থনে কথা বলার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আমাদের থাকবে। অথচ তা করতে গেলে অতি সুনিশ্চিতভাবে আমরা আফ্রিকা (বিশেষ করে পূর্ব আফ্রিকায়) ভারতবিরোধী মনোভাব শক্তিশালী করব। একথা ঠিক যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নির্যাতনের প্রতিবাদ আমরা করেছি, যদিও সে প্রতিবাদ খুব কার্যকর হয়েছে এমন দাবি কেউ করবে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সে প্রতিবাদ বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাসী ইওরোপীয় শাসকদের বিরুদ্ধে, যে ইওরোপীয় শাসনকর্তারা আফ্রিকানদেরও শোষণ ও উৎপীড়ন করছে। এবং সে প্রতিবাদে আর কিছু না হোক প্রায় সারা পৃথিবীর সমর্থন আমরা পেয়েছি। ট্যাঙ্গানাইকার ব্যাপার একটু অন্য ধরণের হবে। এখানকার ভারতীয়দের একটা বড় অংশ অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আফ্রিকানদের শোষণ করছে। আমরা জানি অনেক সময় শোষিত-নির্যাতিতদের প্রতিবাদ তথাকথিত শোভনতার সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়। তা ইতিহাসেরই নিয়ম। কোনো কোনো নির্দোষ ব্যক্তিও লাঞ্ছিত হতে পারেন। কিন্তু এই অজুহাতে যদি কোনো বিদেশী সরকার কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ সংখ্যালঘু শোষকসম্প্রদায়ের পক্ষে এগিয়ে আসে, তবে তার পক্ষে অন্যদেশের সমর্থন পাওয়া দুষ্কর। এমনকি, ভারতবর্ষের প্রগতিবাদী শক্তিসমূহও সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। অতএব, এই উভয় সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে যদি ট্যাঙ্গানাইকায় অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব না হতে দেওয়া যায়। অবশ্য এই ব্যাপারে ভারতের কর্মোদ্যম সীমিত। তবু নানা পরোক্ষ উপায়ে আমরা সেই উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারি।

ট্যাঙ্গানাইকার, তথা সমগ্র পূর্ব আফ্রিকার রাজনীতির ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার "বিশেষ প্রয়োজন" আমাদের এইখানে।

দুই

অন্য অনেক আফ্রিকান রাষ্ট্রের তুলনায় ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল মাত্র ৪টি : উত্তর পূর্বে মিশর ও ইথিওপিয়া, পশ্চিমে লাইবেরিয়া ও দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে তার সঙ্গে যুক্ত হল পূর্বতন ইতালীয় উপনিবেশ লিবিয়া, ১৯৫৬ সালে সুদান টিউনিসিয়া ও মরক্কো, ১৯৫৭ সালে ঘানা, ১৯৫৮ সালে গিনি, আর তারপর ১৯৬০ সালে ক্যামেরুন্স, টোগোল্যাণ্ড, মালি যুক্তরাষ্ট্র (যা থেকে পরে সেনেগাল বিচ্ছিন্ন হয়), নাইজার, দাহোমে, উর্ধ্ব ভলতা মরিডানিয়া, কোৎ দিভ্বোয়ার, কঙ্গো (পূর্বতন বেলজিয়ান), নাইজেরিয়া, সোমালিয়া ও মাদাগাস্কার। ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে স্বাধীনতা পেল পশ্চিম আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশ সিয়েরা লিওন। সর্বশেষে ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা এল ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে, অর্থাৎ যখন ইতিমধ্যেই ২৪টি আফ্রিকান দেশ স্বাধীন হয়েছে।

তবু মনে রাখা দরকার আফ্রিকা মহাদেশের (বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার) বিচারে ট্যাঙ্গানাইকার স্বরাজপ্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত হলেও, পূর্ব আফ্রিকার অন্য দেশের পূর্বসূরী হল স্বাধীন ট্যাঙ্গানাইকা। সুদান, বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড (যে দেশ ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীন সোমালিয়া গঠন করেছে) ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপ ছাড়া উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানাইকা হল প্রথম দেশ যেখানে আফ্রিকানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেল। শুধুমাত্র এইজন্যই ট্যাঙ্গানাইকার আঞ্চলিক নেতৃত্ব করার সুযোগ ছিল। এছাড়া অবশ্য অন্য কারণও রয়েছে। প্রথম হল, এ দেশের আয়তন, দ্বিতীয় লোকসংখ্যা, তৃতীয় ভৌগোলিক অবস্থান। এ সমস্তই হল ট্যাঙ্গানাইকার নেতৃত্বের পক্ষে অনুকূল। আর এর সঙ্গে বোধকরি যোগ করা যায় ট্যাঙ্গানাইকার ঐক্য। উগাণ্ডায় আফ্রিকান জাতীয় আন্দোলন বরাবর উগাণ্ডার আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং যদি মনে রাখা যায় যে বুগাণ্ডা হল উগাণ্ডার সমৃদ্ধতম অঞ্চল এবং বাগাণ্ডা উপজাতি (বুগাণ্ডার অধিবাসী) উগাণ্ডার একক বৃহত্তম উপজাতি ও সমগ্র উগাণ্ডার অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ, তবে এই ক্ষতির পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে। কেনিয়ার উপক্রত রাজনীতিতে 'কানু' (কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল

ইউনিয়ন) ও 'কাডু'র (কেনিয়া আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন) বিরোধ ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করছে। জাঞ্জিবারে আরব-আফ্রিকান বিভেদ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অংশগ্রহণ করছে। ট্যাঙ্গানাইকার আফ্রিকান নেতৃত্বের ঐক্যের একমাত্র তুলনা মেলে নায়াসাল্যাণ্ডে। কিন্তু নায়াসাল্যাণ্ড ট্যাঙ্গানাইকার তুলনায় খুবই ছোট দেশ। তাছাড়া ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক ঐক্য শুধু আফ্রিকানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রীজুলিয়াস নিয়েরেরে ও 'টান্থ'র নেতৃত্ব ভারতীয় ও ইওরোপীয়েরা পর্যন্ত মেনে নিয়েছে। এমন সমর্থন নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকান নেতা শ্রীহেস্টিংস বাণ্ডার ভাগ্যেও জোটেনি। তাই, সব মিলিয়ে ট্যাঙ্গানাইকা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার নেতৃত্ব দিতে পারে। এবং এদেশের অপেক্ষাকৃত সম্প্রীতিময় বর্ণসম্পর্ক এই বিরাট এলাকার পক্ষে আশীর্বাদের মতো হবে।

আফ্রিকান-ভারতীয়-ইওরোপীয় বোঝাপড়াকে অন্য দেশে সম্প্রসারিত করার সুযোগও বর্তমান। পূর্ব আফ্রিকার নেতারা সেখানকার বিভিন্ন দেশ নিয়ে এক পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন। কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার নেতারা এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। উগাণ্ডায় বাগাণ্ডা নেতৃত্ব সে দেশের অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে এক রাষ্ট্র গঠন করতেই গররাজী। অতএব, পূর্ব-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের উচ্ছ্বসিত হওয়ার কথা ওঠে না। তবে উগাণ্ডার কোনো কোনো অ-বাগাণ্ডা নেতা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

ভবিষ্যতের যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে বর্তমান পূর্ব আফ্রিকান হাই কমিশন। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী। অবশ্য এর আগে, এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে, বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে (যথা, দেশরক্ষা, ডাক ও তার, শুল্ক ও আবগারী, আয়কর, বিমান-পরিবহন, মুদ্রা, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি) কেনিয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানাইকার জন্য সাধারণ শাসন প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু ১৯৫৮ সালেই পুরোদস্তুর পূর্ব-আফ্রিকান আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হল। এবং ৭ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হাই কমিশনের এক্তিয়ারে-আসা বিষয়গুলির শাসনভার পেলেন। এর সঙ্গে বোধহয় পূর্ব-আফ্রিকান আপীল আদালতের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯০৯ সালে আদালত স্থাপিত হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এর এক্তিয়ার এডেন, উগাণ্ডা, কেনিয়া, জাঞ্জিবার,

ট্যাঙ্গানাইকা, সেচেলেস দ্বীপ ও বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন অবশ্য শেষোক্ত দেশ স্বাধীন সোমালিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পূর্ব-আফ্রিকান আপীল আদালতের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়েছে।

সে যাইহোক, আইন প্রণয়ন, বিচার ও কার্যনির্বাহী এই তিন বিভাগেই পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো এখনই চালু রয়েছে। অতএব, প্রচলিত ব্যবস্থাকে অল্প স্বল্প পরিবর্তিত করে এক পূর্ণায়তন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হওয়ার কথা নয়।

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠন মিলে এক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে যার সংক্ষিপ্ত নাম হল প্যাফমেকা (পি. এ. এফ. এম. ই. সি. এ. : প্যান আফ্রিকান মুভমেণ্ট অফ ইষ্ট অ্যাণ্ড সেনট্রাল আফ্রিকা। অর্থাৎ পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার একীকরণ আন্দোলন)।

এই আন্দোলনে কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার সোৎসাহ সমর্থন আছে একথা আগে বলা হয়েছে। উগাণ্ডার নেতৃত্ব কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। যদিও ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে জাঞ্জিবারের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে যুক্ত, তবু সেখানকার আরব সুলতান ও অভিজাতেরা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে জাঞ্জিবারের অন্তর্ভুক্তি সুনজরে না দেখতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের পক্ষে জাঞ্জিবারকে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। এবং খুব সম্ভবত সে চেষ্টায় তারা সাফল্যলাভও করবে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার সমর্থন আসছে নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকানদের কাছ থেকে। এই ছোট্ট দেশটি বহু-বিতর্কিত মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অংশীদার (অন্য দুই অংশীদার হল উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া)। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশি, আফ্রিকানরা অনেক বেশি অনাচার ও বৈষম্যনীতির শিকার। তাই নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার আফ্রিকানরা দাবি করেছে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে দেবার। বেশ কিছু ইওরোপীয় বাসিন্দা থাকায় উত্তর রোডেশিয়ার আফ্রিকানদের আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নায়াসাল্যাণ্ডের সৌভাগ্যক্রমে সেখানকার ইওরোপীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা নগণ্য। উত্তর রোডেশিয়ার মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদও সেখানে নেই। তাই নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকান অগ্রগতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। নায়াসাল্যাণ্ডের পক্ষে পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি মুক্তি

পাওয়ার সামিল। তাই এখানকার আফ্রিকান নেতারা নায়াসাল্যাণ্ড সহ পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবে সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছেন। অনুমান করা শক্ত নয় যে কেনিয়ার আফ্রিকানদের সমর্থনের পেছনেও অনুরূপ মনোভাব রয়েছে। কেনিয়া হল 'শ্বেত' ঔপনিবেশিকদের শক্ত ঘাঁটি: সংখ্যায়, সমগ্র অধিবাসীর শতকরা-অনুপাতে, জমির মালিকানায়, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে এবং রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতায়। একলা হাতে লড়ে প্রতিক্রিয়ার এই ঘাঁটিকে উৎখাত করতে কেনিয়ার আফ্রিকানদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলির আফ্রিকানদের সহযোগিতায় এ কাজ সহজতর হবে তাতে সন্দেহ কী? প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র শুধু সেই সহযোগিতাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেবে মাত্র।

তিন

ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা আর একটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে: তা হল সারা পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের মুমূর্ষু অবস্থা। আজ আফ্রিকার অধিকাংশ স্বাধীন হয়েছে। পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি, আলজেরিয়া, উগাণ্ডা, কেনিয়া, জাঞ্জিবার, উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া, নায়াসাল্যাণ্ড, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি স্পেনীয় পকেট, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি, বেচুয়ানাল্যাণ্ড, বাসুটোল্যাণ্ড ও সোয়াজিল্যাণ্ড ছাড়া অন্য সব দেশ স্বাধীন হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। উগাণ্ডা আগামী বছরে স্বাধীনতা পাবে বলে ঠিক হয়েছে। রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির স্বাধীনতাও আসন্ন। পূর্বোক্ত তালিকায় অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের নামও যোগ করা যায়, কারণ আন্তর্জাতিক আইনের বিধানে সে দেশ স্বাধীন হলেও সেখানে আফ্রিকানরা কোনো ক্ষমতা পায়নি। আর উল্লেখ করা যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন শাসিত দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার, যার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ইউনিয়ন সরকারের সঙ্গে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বহুদিন যাবৎ বাদ-বিতণ্ডা চলছে।

এতগুলি দেশে আফ্রিকানরা এখনো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে বঞ্চিত হলেও যেসব দেশে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছে তাদের তালিকা হবে বৃহত্তর, তাদের আয়তন ও লোকসংখ্যা হবে আরও বেশি। এ সব দেশের বেশির ভাগ স্বাধীনতা পেয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে এবং আগামী কয়েক

বছরে আলজেরিয়া, কেনিয়া, জাঞ্জিবার, নায়াসাল্যাণ্ড ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির ভাগ্য নির্ধারিত হবে বলে আশা করা যায়। একদিক দিয়ে বলা যায়, ঘানা পশ্চিম আফ্রিকায় যে প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করে, পূর্ব আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানাইকা থেকে সেই প্রক্রিয়ার শুরু। পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা ও পূর্ব আফ্রিকায় ট্যাঙ্গানাইকার অবস্থার তুলনা করার ইচ্ছা এক্ষেত্রে স্বভাবত আসে। উভয়ত: আমরা এমন দেশের উল্লেখ করছি যে দেশ সমগ্র অঞ্চলের স্বাধীনতার পুরোধা। দুই দেশেই আমরা বিশেষ রকমের যোগ্য নেতৃত্বের (দলীয় ও ব্যক্তিগত) পরিচয় পাই।

এইখানেই কিন্তু এদের সাদৃশ্যের পূর্ণচ্ছেদ। ঘানা ও ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনৈতিক অবস্থা ছিল ভিন্ন। ঘানা ছিল বৃটেনের গোল্ডকোস্ট উপনিবেশ, ট্যাঙ্গানাইকা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে বৃটেন-শাসিত অছি-অঞ্চল। ঘানার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য বহু পুরাতন: ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ফান্তি কনফেডারেশন' থেকে তার জন্ম। ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু মাত্র কয়েক বছর আগে। এদেশের প্রথম ও অধুনা বৃহত্তম রাজনৈতিক দল 'টানু'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৪ সালে। ঘানার রাজনৈতিক আন্দোলন অনেক সময় শাসনতন্ত্র-সম্মত পথে না গিয়ে জন-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে (যথা শ্রীন্‌ক্রুমার নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের সারাদেশব্যাপী ধর্মঘট, যখন ন্‌ক্রুমাসহ বহুলোককে গ্রেপ্তার করা হয়)। পক্ষান্তরে ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে মসৃণ। প্রতিবাদ, ধর্মঘট ও জনবিক্ষোভের পথে 'টানু' বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে কখনও নামতে হয়নি। ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রদায়ের কথা মনে রাখলে এই অবাধ ও অনুপদ্রুত রাজনৈতিক প্রগতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনোত্তর রাজনীতিতেও এই দুই দেশের পার্থক্য দেখা যাবে বলে মনে হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সমবায়ে এক বৃহত্তর রাষ্ট্রগঠন শ্রীন্‌ক্রুমার স্বপ্ন ছিল। প্রস্তাবিত ঘানা-গিনি-মালি ইউনিয়ন গঠন অবশ্য সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নের দিকে এক ধাপ অগ্রগতি। কিন্তু শ্রীন্‌ক্রুমার যতটা আশা ছিল তার সামান্য অংশই কার্যকরী হয়েছে। এর একটা বড় কারণ, ঘানার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিকাংশ হল ভূতপূর্ব ফরাসী উপনিবেশ এবং সে হিসাবে তাদের সরকারী ভাষা, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক ধারা পর্যন্ত ভিন্নধর্মী। এক অসাধারণ

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঘানা-গিনির সংযুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। পরে অবশ্য মালি প্রজাতন্ত্রের নামও এর সঙ্গে যুক্ত হল। কিন্তু বাস্তবে তিনটি দেশের সাধারণ শাসন কাঠামো স্থাপনের কাজ বিশেষ এগিয়েছে বলে জানা যায়নি। এর তুলনায় পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা সহজতর হওয়া সম্ভব। এ সব দেশের সমস্যা অনেকখানি এক ধরণের। এদের রাজনৈতিক ইতিহাস মোটামুটি একপাতে বয়ে গেছে। এরা সকলেই ছিল বৃটিশ-শাসিত উপনিবেশ, আশ্রিতরাজ্য কিংবা অছি-অঞ্চল। এবং সবচেয়ে বড় কথা এদের অনেকের ঘনিষ্ঠ সহযোগের ভিত্তিতে গঠিত ইষ্ট আফ্রিকা হাই কমিশন এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয়ভাবে কাজ চালাচ্ছে। তাই স্বাধীনোত্তর কালে ট্যাঙ্গানাইকার পূর্ব আফ্রিকা একীকরণের প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অনেকখানি থাকবে।

এসব পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের পূর্বেকার বক্তব্য এখনও বলবৎ আছে। অর্থাৎ ঘানার স্বাধীনতা যেমন পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক, ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা তেমনি পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশের অগ্রগ। পরোক্ষভাবে বলা যায়, ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে পূর্ব আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীরে এই প্রথম ফাটল ধরল (বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ও সুদানকে এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না)। এবং এই ফাটল যে আরো বেড়ে গিয়ে অন্য দেশকে গ্রাস করবে সেকথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ট্যাঙ্গানাইকা অবশ্য কেনিয়া, উগাণ্ডা কিংবা জাঞ্জিবারের মতো বৃটিশ-শাসিত অঞ্চল ছিল না। আন্তর্জাতিক আইনে ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক অবস্থাকে অছি-অঞ্চল বলা হবে: এমন অঞ্চল যার শাসন পরিচালনা ছিল বৃটেনের হাতে, কিন্তু যার শাসন কর্তৃপক্ষকে তত্ত্বাবধান করার ও উপদেশ দেবার ক্ষমতা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের ছিল। ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এই অছি-ব্যবস্থার গুণাপগুণ বিচারের সুযোগ দিচ্ছে।

অছি-ব্যবস্থাকে ভালো করে বুঝতে গেলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে তার ভূমিকা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে তেমনি তার ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট সম্পর্কেও পরিপূর্ণ অবহিত থাকা দরকার। অছি-ব্যবস্থার পূর্বসূরী ছিল ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মান ও তুর্কী উপনিবেশসমূহ নিয়ে মিত্রপক্ষের মধ্যে প্রচুর

তর্ক-বিতর্কের অবতারণা হয়। কতকগুলি দেশ যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ও অষ্ট্রেলিয়ায় ঐ সব উপনিবেশ সরাসরি দখল করার পক্ষে ছিল। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি উইলসনের নেতৃত্বে আর একদল তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এই দুই বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে এক রকমের আপোষ হয় ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

পরাজিত শত্রুর উপনিবেশগুলি বিভিন্ন বিজেতাশক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল। স্থির হল, এদের শাসন পরিচালিত হবে লীগ অফ নেশন্সের তত্ত্বাবধানে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার অসম মানের জন্য এ সমস্ত উপনিবেশকে (যাদের নাম হল ম্যাণ্ডেট বা 'ন্যাস' অঞ্চল) তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। 'ক' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট: যে সব দেশের অধিবাসীরা অল্প দিন বাদেই স্বাধীনতা আশা করতে পারে বলে ধরে নেওয়া হয়। ভূতপূর্ব তুর্কী সাম্রাজ্যের আরব-অধ্যুষিত উপনিবেশগুলি এই শ্রেণীতে পড়ল [সিরিয়া-লেবানন (শাসক: ফ্রান্স), প্যালেস্টাইন ও ইরাক (শাসক: বৃটেন)]। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়া জার্মানীর অন্য সব আফ্রিকান উপনিবেশ 'খ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট পর্যায়ে পড়ল। কয়েকটি মৌলিক নীতি অনুসারে এখানকার শাসনকার্য পরিচালিত হবে বলে ঠিক হল। এই 'খ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট শাসনের প্রবর্তন করা হয় নিম্নলিখিত দেশসমূহে: বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড, ফরাসী টোগোল্যাণ্ড, বৃটিশ ক্যামেরুন্স, ফরাসী ক্যামেরুন্স, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি (শাসক: বেলজিয়াম) এবং ট্যাঙ্গানাইকা (শাসক: বৃটেন)।

এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের জার্মান উপনিবেশগুলিকে 'মিত্রপক্ষীয়' নেতারা 'গ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট বলে বর্ণিত করলেন। শাসক দেশগুলি এইসব অঞ্চলকে নিজ দেশের অংশ হিসাবে শাসন করতে পারবেন বলে ঠিক হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনে বিশ্বজনমতকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করেছে বলে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থাকে অভিনব আখ্যা দেওয়া যায়। একথা ঠিক যে, লীগ অফ নেশন্স তথা স্থায়ী ম্যাণ্ডেটস কমিশনের ক্ষমতা ছিল অতিমাত্রায় সীমিত। বলতে গেলে শুধুমাত্র উপদেশ দেবার ও সমালোচনা করবার অধিকার তাদের ছিল। তবু বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করা বড় সহজ কথা নয়। এবং এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে লীগ অফ নেশন্সের সমালোচনায় ম্যাণ্ডেট শাসক তার নীতি বদলিয়েছে। অতএব ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার প্রবর্তকদের বৈপ্লবিক

পরিকল্পনা কিংবা বিশ্বপ্রেমী সদিচ্ছা ছিল একথা বলা না গেলেও, এ ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক জগতে কোনো পরিবর্তনই আনেনি এমন যুক্তি দিয়ে একে নস্যাৎ করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লীগের অপমৃত্যুর আগেই একটি ম্যাণ্ডেট শাসিত অঞ্চল (ইরাক) রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা পায়। যুদ্ধোত্তর কালে বাকি 'ক' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটগুলিও স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হল। অন্য ম্যাণ্ডেট-শাসিত দেশ-গুলি (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়া) নিয়ে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের অধীনে অছি-ব্যবস্থার শুরু। ১৯৪৬ সালে অছি-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত নিম্নলিখিত অছি-অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে :

বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড : ১৯৫৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘানার সহিত সংযুক্ত।

ফরাসী টোগোল্যাণ্ড : ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে।

ফরাসী ক্যামেরুন্স : ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে।

বৃটিশ ক্যামেরুন্স : উত্তরাংশ স্বাধীন নাইজেরিয়ার সঙ্গে ও দক্ষিণাংশ স্বাধীন ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রের (পূর্বতন ফরাসী ক্যামেরুন) সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

সোমালিল্যাণ্ড : অছি-অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র এই দেশটি ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইতালীর পরাজয়ের পর ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডকে অছি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬০ সালে এ দেশটি স্বাধীনতা পায়।

রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি : শীঘ্রই স্বাধীনতা পাবে বলে স্থির হয়েছে।

ট্যাঙ্গানাইকা : ৯ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা পেল।

সামোয়া : আগামী বছরে স্বাধীনতা পাবে।

ট্যাঙ্গানাইকা ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির স্বাধীনতা লীগ পরিচালিত 'খ' শ্রেণীর সমস্ত ম্যাণ্ডেটের স্বাধীনতা সমাধা করবে।

'গ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট-অঞ্চলগুলি অবশ্য এতটা ভাগ্যবান নয়। এদের মধ্যে একমাত্র পূর্বোক্ত দেশ সামোয়ার স্বাধীনতা স্থিরীকৃত হয়েছে। নাউরু (অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড ও বৃটেনের পক্ষে শাসন পরিচালনা করে অস্ট্রেলিয়া) ও পূর্ব নিউগিনির (শাসক : অস্ট্রেলিয়া) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কিছু বলা মুস্কিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অছি-অঞ্চল (ক্যারোলিন, মার্শাল ইত্যাদি

দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত) লীগ অফ নেশন্সের আমলে জাপানের শাসনাধীনে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে এই অঞ্চলটিকে একটি বিশেষ শ্রেণীর অছি-দেশে (ষ্ট্র্যাটেজিক এরিয়া) রূপায়িত করে। এর শাসনভার দেওয়া হয়েছে আমেরিকান সরকারের হাতে এবং এর ওপর সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধান-ক্ষমতা কিছুটা সঙ্কুচিত করা হয়েছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে এই অঞ্চলটা প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হওয়ায় এর ভবিষ্যৎ কী হবে বলা যায় না। বাকি থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন এই দেশটিকে অছি-ব্যবস্থার মধ্যে আনতে অনিচ্ছা জানিয়ে একে নিজের 'পঞ্চম-প্রদেশ'-এ (ইউনিয়নে মোট ৪টি প্রদেশ আছে) পরিণত করতে চেয়েছে। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এতে আপত্তি জানালেও ইউনিয়ন সরকার তাতে কর্ণপাত করে নি।

এই গেল অছি-অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক প্রগতির খতিয়ান। ম্যাণ্ডেট ও অছি-ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আসে মোট ১৫টি দেশ। এর মধ্যে এতদিন পর্যন্ত পরাধীনতা-মুক্ত হয়েছে ৮টি দেশ। ট্যাঙ্গানাইকা সহ আরও তিনটি দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। বাকি থাকে মাত্র ৪টি অঞ্চল, অদূর ভবিষ্যতে যাদের স্বাধীনতা-অর্জনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যদি ধরে নেওয়া যায়, শুধুমাত্র কিংবা প্রধানত অছি ও ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থার কল্যাণে পূর্বোক্ত দেশগুলির স্বাধীনতা এসেছে, তবে লীগ ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পক্ষে তার চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে।

দুঃখের বিষয়, এমন কথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। ম্যাণ্ডেট ও অছি-ব্যবস্থা অবশ্যই উল্লিখিত দেশগুলির স্বাধীনতা-অর্জনে কিছুটা সাহায্য করেছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর সমর্থন এসেছে অন্যথান থেকে। অথবা ভাষান্তরে বলা যায়, যে শক্তির প্রভাবে গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ সারা পৃথিবীর পরাধীন অঞ্চল সমূহ নিজ নিজ আত্মস্বাতন্ত্র্য অর্জন করছে, তারই এক প্রকাশ হল ম্যাণ্ডেট ও অছি-ব্যবস্থা। এটা কি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয় যে, যে সময়ে মোট ৮টি ম্যাণ্ডেট বা অছি-শাসিত অঞ্চল স্বরাজ পেল, সে সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত) দুই ডজনেরও বেশি উপনিবেশ (যারা ম্যাণ্ডেট বা অছি-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না) স্বাধীন হয়েছে? একথা অবশ্য ঠিক যে ইরাক ১৯৩২ সালে ম্যাণ্ডেট-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়, কিন্তু তাতে লীগ অফ নেশন্স-এর কতটা হাত ছিল তা বিতর্কের বিষয়।

একথা ঠিক যে, সোমালিল্যাও অছি-অঞ্চল ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পাবে বলে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ স্থির করে। কিন্তু এর পেছনে বড় কারণ যে সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতদ্বৈধ, সেকথা সুবিদিত।

ইচ্ছা থাকলেও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ যে কোনো অছি-অঞ্চলের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে পারে না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া গেছে ট্যাঙ্গানাইকার ইতিহাস থেকে। ১৯৫৪ সালে ট্যাঙ্গানাইকায় জাতিসঙ্ঘপ্রেরিত এক মিশন প্রস্তাব করে, এই অছি-দেশটিকে ২০ বছর বাদে স্বাধীনতা দেওয়া হোক এবং শাসক-রাজ্য বৃটেন এই উদ্দেশ্যে রীতিমত এক পরিকল্পনা তৈরি করে সেই পরিকল্পনা-অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকুক।

জাতিসঙ্ঘের ইতিহাসে এই প্রস্তাব রীতিমত অভিনব। সম্ভবত যারা পৃথিবীর মানুষদের স্বাধীন ও আত্মনির্ভর দেখতে চায় তারা প্রায় সকলেই একে অভিনন্দন জানাল। প্রতিবাদ আসল কয়েকটি উপনিবেশ-শাসনকারী দেশ এবং বিশেষ করে বৃটেনের কাছ থেকে। সেই প্রতিবাদে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হল। এই ঘটনা ঘটেছে ১৯৫৪-৫৫ সালে এবং পূর্বোক্ত প্রস্তাব-অনুসারে ১৯৭৫ সাল ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা-প্রাপ্তির বছর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আফ্রিকায় 'পরিবর্তনের হাওয়া' (না ঝড় ?) বয়ে গেছে। ১৯৫৫ সালে ঝানু বৃটিশ শাসকদের মনে হয়েছিল ১৯৭৫ সাল বড় বেশি কাছে। কয়েক বছর যেতে না যেতে সকলের (এমন কি বৃটিশ শাসকদেরও) মনে হল ১৯৭৫ সাল বড় বেশি দূরে।

উপরিউক্ত উদাহরণটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা সরলীকরণে যথার্থ সাহায্য করে। এর থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি : সাধারণভাবে সমালোচনা ও সুপারিশ করা ছাড়া অন্যভাবে অছি-অঞ্চলের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা জাতিসঙ্ঘের সাধ্যায়ত্ত হয় নি। এবং এতদুদ্দেশ্যে জাতিসঙ্ঘকৃত কোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্যে সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে অছি-শাসকেরা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যল্পকালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন দিকে মোড় ঘুরেছে যে অছি-অঞ্চল ও উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেবার আয়োজন করতে হয়েছে। অবশ্য উল্লিখিত আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জাতিসঙ্ঘে যথাযথভাবে প্রতিফলন হওয়া স্বাভাবিক : জাতিসঙ্ঘে যা সমালোচনা হয়, তা সদস্য রাষ্ট্ররা

করে থাকে। প্রস্তাব যা ওঠে, তা আসে সদস্য রাষ্ট্রদের কাছ থেকে এবং যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাও নির্ধারিত হয় সদস্য রাষ্ট্রদের ভোট অর্থাৎ মতামত দ্বারা। অতএব আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে অছি-পরিষদ ও জাতিসঙ্ঘকে পৃথক করে বিবেচনা করা ভুল হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে অছি-ব্যবস্থা হল মহাযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক নীতিগুলির প্রতিষ্ঠানগত রূপমাত্র। আর সেক্ষেত্রে, জাতিসঙ্ঘের সমালোচনা ও সুপারিশকে বলা যায় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আবহাওয়ার ব্যারোমিটার।

তুলনাটা অবশ্য যত মুখরোচক, ততটা যথাযথ হল না। ব্যারোমিটারের পারা আবহাওয়ার সূচকমাত্র। তার ঊর্ধ্ব বা অধোগতি আবহাওয়াকে কোনো অংশে প্রভাবিত করে না। জাতিসঙ্ঘ সম্পর্কে আমরা এমন কথা বলতে পারি না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় জাতিসঙ্ঘের আলাপ-আলোচনা, বাদ-বিতণ্ডা, সুপারিশ প্রভৃতি থেকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর এদের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। অর্থাৎ এ হল এমন এক ব্যারোমিটার যা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে সেই পূর্বাভাসের মারফৎ আবহাওয়াকে কিছুটা পরিমাণে রূপান্তরিতও করে থাকে। আর যে পরিমাণে এই রূপান্তরণ ঘটে, সেই পরিমাণে জাতিসঙ্ঘ বিশ্বরাজনীতির নিরপেক্ষ ব্যারোমিটারের কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হয়।

অছি-অঞ্চলগুলির স্বাধীনতায় জাতিসঙ্ঘের অবদান সম্পর্কে এই হল আমাদের নিবেদন।

চার

ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা গেল।

আমাদের প্রথম বক্তব্য ছিল, ট্যাঙ্গানাইকান-ভারতীয় সম্পর্ক আমাদের দেশের সঙ্গে সমগ্র মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার সম্পর্কের চাবিকাঠি। এবং আজ যদি আমরা ট্যাঙ্গানাইকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবে আগামীকাল এর প্রভাব গিয়ে পড়বে অন্যান্য দেশের ওপর। এমন প্রভাব ট্যাঙ্গানাইকা থেকে অন্যত্র সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, কারণ পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার নেতৃত্ব অনেকাংশে ট্যাঙ্গানাইকার হাতে আসবে।

বর্তমান প্রবন্ধে এ-কথাও বলা হয়েছে যে ট্যাঙ্গানাইকান-ভারতীয় সম্পর্ক বিষিয়ে উঠবে যদি প্রথমোক্ত দেশে আফ্রো-ভারতীয় প্রতিযোগিতা প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়। অতএব, শুধু ট্যাঙ্গানাইকা-প্রবাসী ভারতীয়দের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যই নয়। এদেশের সঙ্গে সারা মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার সুসম্পর্ক বজায় রাখবার জন্যও বটে, ট্যাঙ্গানাইকায় বর্ণসম্পর্ক সুপথে চালিত করতে হবে।

এই প্রবন্ধের অন্যতম সিদ্ধান্ত হল এই যে, ঘানার স্বাধীনতা যেমন সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক মুক্তির অগ্রদূত ছিল, ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা তেমনি মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার মুক্তিদূত। কিন্তু ঘানার পক্ষে পশ্চিম আফ্রিকায় এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যত না সহজ হয়েছে, ট্যাঙ্গানাইকার পক্ষে মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন তার চেয়ে কম কষ্টসাধ্য হওয়া সম্ভব।

আফ্রিকা তথা পৃথিবীর রাজনীতিতে এ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এবং ভারতবর্ষের পক্ষে এ সম্ভাবনার তাৎপর্য উপলব্ধি যে বিশেষ প্রয়োজন সে কথা কি নতুন করে বলতে হবে? পূর্ব-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র হবে আয়তনে ভারতবর্ষের অর্ধেক এবং আরব সাগরকে বাদ দিলে একে আমাদের নিকট প্রতিবেশী বলা চলে। এই দেশে থাকবে তিন চারটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর—মোম্বাসা, দার-এস-সালাম, জাঞ্জিবার। অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এমন অধিবাসীবৃন্দ যাদের উচ্ছল প্রাণশক্তি, কর্মোৎসাহ ও স্বভাবজ বুদ্ধি এক সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে।

সর্বশেষে ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা পরাধীন দেশগুলির মুক্তি প্রক্রিয়ায় অছি-ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ট্যাঙ্গানাইকা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম অছি-অঞ্চল। এ দেশের স্বাধীনতার পর আফ্রিকায় আর একটি মাত্র দেশ, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি, অছি-ব্যবস্থার মধ্যে রইল। আর এই দেশটির স্বাধীনতাও স্থিরীকৃত হয়েছে।

কিন্তু এই সব দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি অছি-ব্যবস্থার জন্য কতখানি তা বিতর্কমূলক। অছি-ব্যবস্থা তথা সারা জাতিসঙ্ঘকে, বিশ্বরাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অবিধেয়। কারণ বিশ্বরাজনীতির সর্বজনগ্রাহ্য মূলসূত্রের সাংগঠনিক রূপ হল জাতিসঙ্ঘ। অথচ, এই জাতিসঙ্ঘই আবার বিশ্বরাজনীতির অন্যতম ফোরাম। তাই, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মারফৎ জাতিসঙ্ঘ অছি-শাসিত দেশগুলির স্বাধীনতা কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে বলতে হবে। কিন্তু শেষ বিচারে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সামগ্রিক ধারাই যে পরাধীন জগতে ‘পরিবর্তনের ‘ঝড়’ বইয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ৯ই ডিসেম্বর ট্যাঙ্গানাইকার স্বাধীনতা প্রাপ্তি সে পরিবর্তনের একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

কর্তার ভূত

বিষ্ণু দে

কেন এ ভূতের ভয়? কর্তার ভূত-কে
বলো না সাবেক সুরে: ভূত মোর পুত্।
কি হবে হরদম এই রামনাম ব'লে?
যদিই কর্তা আজও লাফ দেন পুঁটকে
অথবা ফচ্‌কে ঘাড়ে, বলো তো তাহলে
সমুদ্রপারের কোন্ সাহেব অদ্ভুত
আংরেজি মন্তরে আজ নামাবে ভূতকে?

সে কবে মিশেছে তার শ্মশানের ছাই
সারাটা দেশের সারা বিশ্বের মাটিতে।
ফুঁ দিলেই উড়ে যায়, এত ঘটা ক'রে
কাকে যে তাড়াও তুমি তাড়ীয়াল ভাই রে।
হাওয়াকে তড়পে তুমি যন্তরমন্তরে
ভাবো কি গলিয়ে নেবে গলির ভাঁটিতে?
রাম বা লক্ষ্মণ কবে খুঁটে খায় ছাই?

ছাড়ো এ ভূতের খেলা, ঘাটে বা কবরে
কর্তার টিকিও নেই, গোরস্তান তুলে
ভূতকে পাবে না, ভূত ছেড়ে বলো কানে
রামনাম সৎ হায়, সততার জোরে

দেখবে ভূতের ভয় সোজা যাবে ভুলে
কারণ ভূতের মাথা তোমারই গর্দানে।
ভূত কি থাকে রে বোকা, শ্মশানে কবরে ?

ক্ষেমাঘেন্না ছেড়ে দিয়ে বলো সোজাসুজি :
চাও সুখ চাও স্বস্তি সচ্ছল আরাম।
তবেই দেখবে কর্তা নিজেই কবরে
পাশ ফিরে নিরুদ্দেশ, এবং যা বুঝি,
দুনিয়ার সব লোক তোমার জবরে
নিশ্চয় ফেলবে হাঁফ—আরে রাম রাম!
আমরাও ওরে দাদা সুখ স্বস্তি খুঁজি।

শতাব্দীর অস্থি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

শতাব্দীর পূত অস্থি সংরক্ষিত মনন-কৌটায়
ছয়ঋতু পরিক্রমা ছয় দিক সকাল-সন্ধ্যায় ;
কালস্পর্শী অন্ধকারে চলে ফেরে ক'জন সৈনিক,
শিরস্ত্রাণ শূন্যশির বর্মহীন তার চতুর্দিক।
সুদীর্ঘ চত্বরে তারা, আত্মমগ্ন, দূরনভস্তল
বিস্ফারিত, আদিগন্ত খরস্রোত, জল ছলছল
বহে যায় ইতিহাস বর্ষে বর্ষে, নিষ্করুণ স্থির ;
পালটায় মানচিত্র, শতাব্দীর মন···শতাব্দীর।

প্রাচীন অক্ষরে লিপ্ত অস্থিলিপি, জন্মের সংস্কার ;
দিনরাত্র ধূসরতা স্তূপে স্তূপে পর্বত-প্রবাল,
রাখি সাধ আজন্মের, ক্ষুদ্র ইচ্ছা, হৃদয়ের ভার
তীব্র স্রোতে বহমান, বর্ষে বর্ষে সেই লিপিকাল
যাদুঘরে, পাঠোদ্ধার, ক'খণ্ড শিলার বিন্যাস,
ক'জন সৈনিক ভ্রষ্ট শতাব্দীর পূতঅস্থিনাশ !

তিমিরায়ণ

শেখ আব্দুল জব্বার

দুর্জ্জেয় মহারাত্রে আলোর মিনার চেয়ে হত, ক্লান্ত মানুষের যে-সব স্থাপত্য
আজো এই পৃথিবীর বুক জুড়ে আছে—

তাদের সবার মুখে নশ্বরতার রেণুই প্রসাধিত, আর
সব মূঢ়-জড়তার সীমার বাইরে যে বোধের আকার—
প্রবাল দ্বীপের মতো জেগে উঠেছিল ;
আজো যাকে ডুবিয়ে রেখেছে তলে সময়ের সমুদ্রের অন্ধকার ঢেউ

যে সব সত্যের দিকে মুখ রেখে আজো যাকে বলি আমরা
আরাধিত, এই সেই তিমির হন্তারক আলো—

সেই চেতনারও 'পর দেখিয়াছি বারবার শূন্যতার
তির্যক, বর্শার ফলার মতো নক্ষত্রের আঁধির ভিতরে
তিমির বিলাসী সব মানুষ-কীটেরা খেলা করে—সংক্রান্তির লগ্ন চেয়ে
মহাউত্তরায়ণের সীমান্ত রেখায়···
যদিও কোথাও আজো নব ধ্রুব আছে, এর-ও অন্ধকার আছে জেনে
তার চোখ কোনো দিন স্থির হয় নাই, অবিরাম পেয়ে পেয়ে পর্যটনের ঢের
অপার বিস্ময়

পৃথিবীর এই সব মহামূঢ় শিকারীর মতো তিমির হননে অগ্রসর—
আবিশ্ব বিপর্যয় ও ব্যর্থতার ঘোষণায় সূচিত মূল্যরা—বারবার ভেঙে ভেঙে
চুরমার হয়ে গেছে,
নিজের আদল আর মুখোস হারিয়ে ফেলে অদ্ভুত সুন্দর হতে—
সূর্যের অন্ধকারে তুমুল জটিল এই পৃথিবীর মতো ;
যেখানের চেতনার স্থাবর নৈরাজ্যে আত্মবিলাপের মতো মানুষের ভাষা
অব্যর্থ বিলোপের গুহার গভীরে শব্দিত হতে হতে স্থির হয়ে যায় ;—

আর অন্যদল আসে নাটকের তৃতীয় অংকের প্রখর আলোর
জ্যোতির্ময়,
যার মুখ পানে চেয়ে নড়ে ওঠে মহাবিশ্ব প্রগাঢ় আশ্বাসে
অন্ত কোনো মহাতিমিরায়ণের সূচনার বোধে।

কেননা আমরা গান শুনব

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সূর্য উঠলে পবিত্র অরণ্যে আমরা গান শুনব। প্রৌঢ় বৃক্ষেরা
বিমর্ষ, শুভ্রতা হারিয়ে পাহাড় বিষণ্ণ, বাতাস মুমূর্ষুর শ্বাস ;

কয়েকটি সুন্দর হরিণ, স্বর্গীয় পাখি এবং একটি কোমল বৃক্ষশিশু
মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ;

দূরে শববাহকের ধ্বনি,
শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসের মিছিলের মতো বাতাস

কয়েকটি মৃত হরিণ, নিহত পাখি এবং একটি ছিন্নমূল বৃক্ষশিশুর
শিয়রে আমরা বসে আছি
কেননা সূর্য উঠলে পবিত্র অরণ্যে আমরা গান শুনব।

স্ট্রাইকের পর

কালিদাস দত্ত

সুব্রত চৌধুরী লিস্টটা তৈরি করে উঠে দাঁড়াল। লিস্টের ওপর শেষবার দ্রুত চোখ বুলোতে বুলোতে কলিং বেল টিপল। বেয়ারা এল না। "বেয়ারা" বলে চেঁচিয়ে উঠবার পূর্ব মুহূর্তে মনে পড়ল বেয়ারা নেই, আসবে না। "ইডিয়ট্‌স্‌। ওয়েট, আ' উইল টিচ্‌ য়্যু এ গুড লেস্‌ন্‌"—বিড় বিড় করে আওড়াল—"শুয়োরের বাচ্চা"।

বাইরে বেরিয়ে এসে লিস্টটা সেন্ট্রির হাতে দিল, "এটা গেটে টাঙিয়ে দাও, জলদি।"

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিল। চারদিন চার রাত ঘুম নেই, প্রায়-নেই আর কি। বন্দী হয়ে আছে এই কামরায়—অফিস বিল্ডিং-এ। স্নায়ুর ওপর অমানুষিক চাপ পড়েছে, এখন বাঁচলে হয়। টয়লেট রুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিল, আয়নায় তাকাল। চেহারাটা শুকিয়ে গেছে, চোখের কোলে আরও গাঢ় হয়ে কালি জমেছে, অত্যাচারের মাত্রা একটু বেশি হয়েছে। শরীর তো! চুলে চিরুনি বুলিয়ে বাসি নেকটাইটা ঠিক করল।

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ গাঙ্গুলি আর একটা শুয়োরের বাচ্চা, ওর বাবাও শুয়োরের বাচ্চা ছিল—অ্যাসিট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার সুব্রত চৌধুরী তার 'বস্‌' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করল। কাল রাত্রে স্পেশাল গার্ডের এস্‌কর্টে গাঙ্গুলি বাড়ি গিয়েছিল। কি? না, ভয়ঙ্কর জরুরি দরকার: চৌড্রি, আমি ভোর হবার আগেই চলে আসব। তুমি একটা ডিসচার্জ লিস্ট তৈরি করো। দেখো, আমি যাচ্ছি, কেউ যেন না জানে। মিসেস গাঙ্গুলি ভয়ঙ্কর অসুস্থ, তিনবার টেলিফোন করেছে।

ভোরের নাম করে আজ বেলা দশটায় এসেছে। কী? না, এই বুড়ো বয়েস সে নতুন বিয়ে করেছে, আমি ব্যাচেলর। কিন্তু আমার ইয়ে তোমার চাইতে কিছু কম নয়। আমিও চার দিন চার রাত বিনতাকে দেখিনি, ছুঁই নি। ভাগ্যিস মিসেস সান্যাল হাতের কাছে ছিল। রিপাল্‌সিভ মিসেস

সান্যাল। কুৎসিৎ। ওকে সুবার্বান অফিসে ট্র্যান্সফার করব। পঁচিশ পার হয়নি, এরই মধ্যে তিনটে বিইয়েছে।

গাঙ্গুলির চেম্বারে এসে বলল, "স্যর, আমি যাচ্ছি।"

গাঙ্গুলি খাচ্ছিল। বললে, "খুব দেরি কোরো না। অবশ্য, একটু ঘুম দরকার। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ফিরো। একজন একজন করে ডেকে স্ক্রুটিনাইজ করতে হবে, বণ্ড সই করাতে হবে। ওরা গেটের বাইরে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটের মধ্যেই ফিরচো তাহলে, কেমন?"

"দুটোর মধ্যেই ফিরব! যাচ্ছি, স্যর।"

চেম্বার থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরাল। বস্‌ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তটা দ্বিতীয়বার স্মরণ করল, তারপর ফটকের দিকে এগোল।

"এই, মিঃ চৌধুরী।"

অফিস বিল্ডিংটা নিঝুম, নিথর। বাইরে ছশো সাতশো মেয়ে পুরুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জটলা করছে, চেঁচাচ্ছে। গেটে সদ্য টাঙানো লিস্টটা একে একে দেখছে, বাইরের এক ঝাঁক হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, খিস্তি করছে। একটি রোগা, অ্যানিমিক, ফ্যাকাশে মেয়ে কাঁদছে। ওরা সবাই ভাবছে, আমরা হেরে গেছি, আমাদের এবার কেটে কুচি কুচি করা হবে। পরস্পর পরস্পরকে গাল দিচ্ছে, দোষারোপ করছে, স্বার্থপরের মতো কেউ কেউ পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে—কেন না ডিসচার্জ লিস্টে নাম নেই—ফিরে এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছে বিজয়ী ভঙ্গিতে। শালা, কখন ভেতরে ঢুকতে দেবে কে জানে। ব্যাটা সেন্ট্রি রাইফেল উঁচিয়ে আছে, যেন ওর বাপের জমিদারী।

"এই, মিঃ চৌধুরী রে—"

ওরা মিঃ চৌধুরীকে দেখল, খিস্তি করার ইচ্ছে সত্ত্বেও করতে পারল না, একজন পাশের লোক শুনতে না পায় এমন অনুচ্চ স্বরে গালাগালি দিয়ে চারপাশে ভয়ে ভয়ে তাকাল। স্বার্থপর একজন সবার সামনেই হাত তুলে নমস্কার করল, চৌধুরী দেখল না, পাশ থেকে কে যেন হাতে থুতু লাগিয়ে স্বার্থপরটার মাথায় সজোরে চাঁটি মেরে চট্‌ করে হাতটা গুটিয়ে নিল, স্বার্থপর বাপ তুলে গালাগাল দিয়ে চতুর্দিকে খুঁজেও 'চাঁটিমার'কে দেখতে পেল না। কিছু জনের মধ্যে অহেতুক বীরত্ব এবং কিছু জনের মুখে চোখে উদ্বেগের কালো শুকনো ছাপ—এর মধ্য দিয়ে চৌধুরী কোনো দিকে না তাকিয়ে স্পেশাল গার্ড

দেওয়া মোটরে উঠে ভাবল, বিনতার বাড়ি যাব। যাবই। ফিরে এসে এই স্কাউণ্ড্রেলদের শিক্ষা দেব। ন্যাংটো করে চাবুক মারব, কত ধানে কত চাল হয় টের পাওয়াব। এখন বিনতার ওখানে। বিষ্টি পড়ছে, ওরা ভিজুক, এর পর রোদ উঠলে রোদে পুড়বে, মাল সব তৈরি হয়ে থাকবে, আমি ছাল ছাড়াব আর কাবাব বানাব। দাঁড়াও। তাতানো শিকে নরম মাংস এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে জলবে, ভাজা ভাজা হবে। এখন বিনতার বাড়ি।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দেবার সময় অবশ্য টালার কথাই বলল, কারণ ড্রাইভার বাড়ি চেনে, অফিসের গাড়িতে অন্যত্র গেলে সন্দেহ হবে, দরকার নেই, বাড়িতে বুড়ি ছুঁয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বিনতার বাড়ি আসা যাবে, এখন টালা।

"চৌধুরী একবার তাকাল না পর্যন্ত—ব্যাটার গাট্‌স্ আছে।"

"তেল হয়েছে।"

"হবারই কথা, এমন জানলে আমিও—"

"চোপরাও শা—। মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।"

"মিস্ সেন, আপনি কাঁদবেন না। এত লোক ডিসচার্জড কখনো হয়? ভয় দেখাচ্ছে। আমরা হেরে গেছি কিনা?"

"হেরেছি মানে? আপাতত যুদ্ধ বন্ধ। আবার হবে।"

"আমার খুব ভয় করছে অজয়দা। আমাদের যে আর কেউ নেই। বুড়ো বাবা, কচি কচি ভাইবোন—"

"এই তো আমরা আছি, এত জন আছে। ভয় কি সবিতা?"

"রোকো। এখানে, ওই দোকানটার সামনে একটু দাঁড়াও।"

সুব্রত চৌধুরী নামল, দোকানে ঢুকল, বললে, "ক্যামেরাটা হয়েছে? অ্যাদ্দিন আসা হয়নি, ব্যস্ত ছিলুম।"

"হ্যাঁ, স্যর। কবে হয়ে গেছে, ভাবলুম—"

দোকানের ছোকরা স্বত্বাধিকারী আলমারি থেকে ক্যামেরাটা বের করল, তোয়ালে দিয়ে মুছে, লেদার কেসে ভরতে ভরতে বলল, "শাটার-টা একেবারে জখম হয়ে গিয়েছিল, বদলাতেই হল। ভালো হয়েছে, একেবারে নতুনই হয়ে গেল। এত দামী রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা যাকে তাকে দেবেন না স্যর। প্রায় শেষ করে দিয়েছিল আর কি। না, কুড়ি নয়, পঁচিশই দেবেন, কুড়ির

মধ্যে সারা গেল না। আপনি দেখবেন কেমন কাজ দেয়, একটু এদিক ওদিক বুঝলে এখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবেন—"

ঠোঁটের সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখ কুঁচকে আসছিল। অনেক কষ্টে তাকিয়ে আর একটা দশ টাকার নোট বের করল চৌধুরী, ক্যামেরাটা নিল। পঁচিশ টাকা, তা হোক, লাখ টাকার কাজে লাগবে। বিনতার একটা ফটো তুলব। "দু রোল ফিল্মও দিয়ে দেবেন।" দুটো নোটই বের করল চৌধুরী।

"আবার আসবেন, স্যর। কোথায় ডেভেলপ করান?"

"নিজেই করি। অনেক দিনের কাল্‌চার।"

"তবে তো কথাই নেই। তবু দরকার হলে আসবেন। নিন।"

চেঞ্জ নিল, দেখল না, পকেটে রাখল মুঠো করে। "আসব।"

পাশের দোকান থেকে এক টিন সিগারেট কিনে মোটরে উঠল। বলল, "চলো, সোজা টালা।"

মোটরের দরজায় জোরে ধাক্কা দিল। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। চৌধুরী বলল, "পাঁচটার সময় এসে নিয়ে যাবে ড্রাইভার।"

ভোরের নাম করে গাঙ্গুলি বেলা দশটায় এসেছে, আমিও দুটোয় বলে পাঁচটায় যাব। জন্তুগুলো ততক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে তৈরি হোক। চৌধুরী ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে বিনতার কথা মনে পড়ে গেল, বলল, "থাক, তোমাকে আর আসতে হবে না ড্রাইভার। আমি ট্যাক্সি করেই যাব।" এখন আর ভয়ের কিছু নেই।

"জী সাব।"

সেন্টি সমেত মোটর উল্টোমুখো হয়ে হাওয়ায় উড়ে গেল।

সুব্রত চৌধুরীর ইচ্ছে হল, ঐ যে দূরে ট্যাক্সিটা আসছে ওইটে করেই বিনতার বাড়ি যায়। ভাবতে ভাবতে সে বাড়িতে ঢুকল, যদিও ভাবল, এ বাড়িতে ঢুকে কি লাভ, এখানেও তো ওরা, মানে ওদের একজন আছে।

"একি, এমন শুকিয়ে গেছিস?"

"এখনই ফিরব, ফিরতেই হবে।"

"সে কি? স্নান কর, খা, একটু জিরো। চেহারা কী হয়েছে!"

"খাব না, অফিসেই খাব, স্নানও অফিসে সেরেছি। শুধু একটু দেখা করে গেলাম। রাণু জয়েন করেছে?"

"না, যায় নি। এখন যাচ্ছে। তুই বোস, এখানেই অল্প একটু কিছু নিয়ে আসি। এখুনি বেরুবি বলছিস? বাবা, কী লাটসাহেবের চাকরি তোর। একটু জিরোবার ফুরসৎ নেই।"

মা বেরিয়ে গেলেন। সুব্রত চৌধুরী টিপয়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সেটিতে হেলান দিল। ফিল্মের একটা রোল বের করে ক্যামেরায় 'লোড্' করল। বিনতার জন্য ওর মনটা ছটফট করছিল। একটু কিছু মুখে ছুঁইয়েই উঠতে হবে। বিনতাকে একটা টেলিফোন নিতে বলব, চৌধুরী ভাবল।

"একি, এসব কি? এসব আমি এখন খাব না।"

চৌধুরীর মন ছটফট করছিল বিনতার জন্য। খেতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট। ও ঠিক করে রেখেছিল, বিনতাকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে খাবে। মায়ের প্রাণ, একেবারে মাছ ভাত নিয়ে হাজির। কি মনে করে প্লেটে হাত ধুয়ে চৌধুরী টিপয়ের ওপর রাখা ভাতের থালায় হাত দিল। চাট্টি খেয়ে নেওয়া যাক, গায়ে বল পাচ্ছি না, চৌধুরী ভাবল, খেলে বল পাব। ঝক্কি আছে না?

"সুব্রামনিয়াম তো তোর বন্ধু। একটু ফোন করে বলিস, রাণু তোর বোন, মায়ের পেটের বোন। রাণু নাকি এখনও বলে নি, কী বোকা মেয়ে।"

"কেন?"

"এই তো মাসখানেকের চাকরি। থাকবে?"

"স্ট্রাইক করার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল? ওর স্ট্রাইকের বন্ধুরা চাকরি রাখতে পারছে না? তাদের ধরুক। তাছাড়া ওর চাকরি যাওয়াই উচিত। আমি চাই না আমার বোন সামান্য কেরানীর চাকরি করে। তাতে আমার প্রেস্টিজ থাকে না। ভিন্ন অফিসে হলেই বা কি, জানাজানি হতে কতক্ষণ? চাকরি ওর যাওয়াই ভালো, একটু শিক্ষাও হবে।"

"তুমি তা হলে বাপু ডেকে বলে দাও। ওই তো রাণু বেরোচ্ছে। রাণু, শুনে যা তোর দাদা কি বলছে—"

রাণু বেরোচ্ছিল। এল। দাদাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। অনিচ্ছুক ঘোড়ার মতো।

সুব্রত চৌধুরী হেসে বলল, "তা হলে, রাণু, চাকরি রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরতে হচ্ছে? স্ট্রাইকের বন্ধুরা চাকরি টেঁকাতে পারবে না,

কেমন? কিন্তু, সুব্রামনিয়ামকে আমি জানাচ্ছি না যে সুব্রত চৌধুরীর বাড়িতে একজন মোটাবুদ্ধির স্ট্রাইকার আছে।"

অপমানে, রাগে রাণুর মুখ লাল হয়ে গেল। বলল, "আমি তো মিঃ সুব্রামনিয়ামকে অনুরোধ করার জন্য কাউকে ধরি নি। চাকরি গেলে আমার যাবে। একটা মাস্টারি অন্তত জুটবে, সে বিদ্যে বাবাই দিয়ে গেছেন। যারা স্ট্রাইকার আমি তাদের শ্রদ্ধা করি, এখনও করি। যারা করে নি, তাদের আমি ঘৃণা করি, এখনও করি, সব সময়ই করব।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল চৌধুরী। চিৎকার করে কি বলতে গিয়ে বিষম খেল, আরও ক্রুদ্ধ হল, বলল, "সে রকম ঘৃণিত লোকের বাড়িতে থাকতেও ঘৃণা হওয়া উচিত, নয় কি? এ বাড়ি আমার—আমারই টাকায় তৈরি। তোমার বাবার নয়।"

"ছি, ছি খোকা—"

"থামো। তোমারই জন্য—"

"আগেই যেতাম, এই চারদিন ধরে সেই কথাই ভাবছি। শুধু তোমাদের মাথা কাটা যাবে বলে অ্যাদ্দিন যাই নি। এবার যাব। আজই আমার জিনিসপত্তর নিয়ে আমি হোস্টেলে চলে যাব।"

"তুই কি পাগল হলি রাণু?"

"তুমি চুপ করো মা, তুমিই আমার সমস্ত সম্ভ্রমটুকু নষ্ট করেছ।"

রাণু বেরিয়ে গেল। সুব্রত চৌধুরী গ্লাসে হাত ডোবাল।

"তুই কিছু বললি না, বাধা দিলি না?"

"যাবে কোথায়? তুমি ক্ষেপেছ, চাকরি থাকলে তবে তো হোস্টেলে যাবে। চাকরিই থাকবে না।"

আঃ, এই তো মা, এই তো বোন। এতদিন যাদের জন্য তুমি কী না করেছ, আজ অপমান করার সময় তারা এতটুকু ভাবে না। আজ তাদের রুচির সঙ্গে আমার রুচি মেলে না, তাদের নীতিবোধ উচিতবোধ আমাকে ঘৃণা করে। আমিই যাকে বানালুম, সেই আজ আমায় চোখ রাঙায়। না, রাণুকে আমি বানাই নি। ওই একই হল, আশ্রয় তো দিয়েছি। তাছাড়া কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো। আমি মনে মনে ভাবছি, ভেবে আনন্দ পাচ্ছি। থ্যাট্স্ অল।

"মাঈজী নহী-ঈ।"

"কোথায় গেছে ?"

"পোরী।"

"একাই ?"

"জী নেহি। বদ্রীদাস সাহাবকো সাথ।"

"বেশ্যা।"

মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল এখানে একটু জিরিয়ে যাবে, বিনতাকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে খাবে। স্নায়ুগুলোর ওপর চাপ চলেছে, একটু রিল্যাকস্‌ড্‌ হয়ে নেবে। বিনতার একটা ফটো তুলবে ভেবেছিল, আর তুলেছে! চৌধুরী ভাবল, বিনতা গৃহস্থ বেশ্যা, হাফ্‌ গেরস্থ, কিন্তু সে যে এত নীচ অ্যাদ্দিন জানতুম না। ছি ছি বিনতা, তোমার ওই হাসি, আদর, মমতা, সহানুভূতি—সবই তাহলে বানানো ? সুব্রত চৌধুরীর কান্না পেল। শেষে বদ্রিদাস···

তুমি ফিরে এস, তারপর তোমাকে দেখব। তোমাকে জখম করব। চৌধুরী রুমালে চোখ মুছল। নিজেকে অসহায় শিশুর মতো মনে হল। কেউ কারো নয়। টাকা দিয়ে কাউকে পুরো কেনা যায় না—ইত্যাকার দার্শনিক-তত্ত্বে তার মনটা প্রথমে ভারী পরে ক্রুদ্ধ হল।

"এই, চৌধুরী ফিরল রে—"

"বাব্বাঃ, কি গটমট করে চলছে। রেগে টং ব্যাটা"—

সুব্রত চৌধুরী কোনোদিকে তাকাল না। কোনোদিন তাকায় না, কেন না বস্‌ অফিসার। দোতলায় উঠে গাঙ্গুলির ঘরে গেল। গাঙ্গুলি বললে, "বাঃ, এরই মধ্যে ? ছুটোও বাজেনি দেখছি। আই মাস্ট সি সো ছাট ইউ গেট ত্থ লিফ্‌ট্‌ সুন। এই ছাখো, সেন্ট্রাল থেকে সেই ইন্‌স্ট্রাকশন এসেছে। নিজের ডিসক্রিশন অনুযায়ী সমস্ত ইনডিভিজুয়াল কেস ডাল করবে। তুমিই এখন সুপ্রীম অথরিটি। আমি এই লিস্টটার ইণ্টারভিউ নিচ্ছি, তুমি এই লিস্টটা নাও। প্রোভোকেটরদের নাম জানার চেষ্টা করবে এবং এমন দু চারটি কথা বলবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন স্ট্রাইক করার প্রবৃত্তি না হয়। ওদের সাধ মিটিয়ে দিতে হবে, মোর‍্যাল ভেঙে গুঁড়োতে হবে। অ্যাণ্ড হোয়েন য়্যু

ক্লাইও এ হার্ডনাট, ক্র্যাক ইট রুথলেসলি। আই মাস্ট্‌ সে, তুমি পারবে, ওন্ট্‌ য়্যু ?

"আ'-উইল স্তর। পারব। আমাকেই সব লিস্ট দিন, আমিই সবার ইণ্টারভিউ নিচ্ছি। আপনি রেস্ট নিন স্তর। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে। য়্যু শূড টেক রেস্ট।"

"একা পারবে ?"

"এ আর এমন কি ? আপনার আণ্ডারে অনেকদিন আছি, শিখেছি।"

"রাইট। আমার একটু বাড়িও যাওয়া দরকার। আচ্ছা নাও। শুধু মিস চক্রবর্তী, ওই যে রিসেপশনের মিস্‌ কমলা চক্রবর্তী, শুধু তার ইণ্টারভিউটা আমি নেব। ওকে ডাকিয়ে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

"আচ্ছা।"

বান্‌চোৎ। মনে মনে উচ্চারণ করল সুব্রত চৌধুরী। তারপর নিজের চেম্বারে চলে এল।

"কান ধরুন।"

ঈশ্বরের আশীর্বাদ, সুব্রত চৌধুরী ভাবল, যে, এই শুয়োরের বাচ্চারা স্ট্রাইক করেছিল। তুমিই এখন সুপ্রীম অথরিটি—ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এত দিন, এই দশ বছর, এই শুয়োরের দল যা খুশি তাই করেছে। পুঁচকে ছেলে আর পুঁটকি মেয়েরা নাক উঁচিয়ে চলে গেছে, ওদের চুলও ছোঁয়া যায় নি। কারণ, সেণ্টাল বোর্ড ছিল সুপ্রীম অথরিটি, বিচার ওই পর্যন্ত গড়াত। আজ এই হাজার হাজার স্ট্রাইকারের বিচার সেণ্ট্রাল করতে পারছে না, সম্ভব না। তাই আমাদের হাতে ক্ষমতা এসেছে। শ্যামল সেন, অমিতাভ সান্যাল, মঞ্জু ব্যানার্জি, বিশাখা সেনগুপ্তার মাংসে আজ শিককাবাব বানাব। এফোঁড়, ওফোঁড় করে নরম মাংসে গরম শিক গুঁজব। তারপর গরমে, ঈষৎ ক্রমশ-উষ্ণ গরমে নাড়াচাড়া দিয়ে তাতাব। চেয়ে চেয়ে দেখব, কেমন ঝলসে, লাল হয়ে, রস গড়িয়ে, তারপর শুকোতে, টানটান হতে শুরু করে। কমলা চক্রবর্তী—ওঃ, ওই কমলা, শুয়োরের বাচ্চা গাঙ্গুলির ঠিক চোখ পড়েছে জানতুম। কমলা চক্রবর্তীকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলুম। অ্যাসিট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার সুব্রত চৌধুরীর ঘরনী হতে পারলে ওর চোদ্দ পুরুষের স্বর্গে স্থান হত। আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন না। স্বজাতি ছাড়া আমি বিয়ে করব

না। খান্‌কি মাগী। স্বজাতি গাঙ্গুলি তোকে বিয়ে করেছে? তার বিছানায় শুতে, তার বাচ্চাকে পেটে ধরে ডাস্টবিনে ফেলতে ধর্মে, রুচিতে বাধেনি? তোমার ইণ্টারভিউ আমার হাতে পড়ার দরকার ছিল। তোমার স্বজাতি গাঙ্গুলি তোমাকে আজীবন, এই বিয়ের পরেও আটকে রাখছে। সেইটেতেই বেশি সুখ, না? চৌধুরীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। অবশ্য, তুমি আজ জানলে দুঃখিতই হবে মিস কমলা চক্রবর্তী, যে, আমিও তোমায় বিয়ে করতুম না। আমার 'বস্' যা করছে, তোমাকে নিয়ে আমিও সেইটুকুই করতুম। তারপর কৃষ্ণা ভৌমিক—

"কান ধরুন।"

"আমি, আমি আপনার বাবার বয়সী, আমাকে—"

"শাট্ আপ্। তুই আমার বাবার ইয়ের বয়সী। কান ধরো—"

খোঁচা খোঁচা তিন চারদিনের আকামানো দাড়ি, সবই প্রায় পাকা, দুর্ভাবনায় চোখ বসা, মাথায় চিরুনী পড়েনি, জামা কাপড় ময়লা, বোধ হয়, যা পরেছিলেন সেই ভাবেই এসেছেন, পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় কৃপানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চোখের মণিতে ঘষে-ছড়ে-যাওয়া-হাতে যেমন ভাবে রক্ত বিন্দু বিন্দু ফুটে ওঠে তেমনি অশ্রুতে ভরে গেল। অপমানে তাঁর মুখ লাল হল, তারপর ভয়ে আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কানে হাত দিলেন কৃপানন্দবাবু। এতক্ষণে চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর আকামানো দাড়িতে।

"তা হলে এখনো আপনি বলবেন না, কার উস্কানিতে স্ট্রাইক করেছেন?"

কৃপানন্দবাবু শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। মাঝে মাঝে কণ্ঠার কাছে শিউরে উঠছে। খুব কষ্ট পাচ্ছেন। চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। দেব?

"বেশ। এবার যেই আমি বলব এক, আপনি বসবেন, দুই বললে উঠবেন। আমি দশ বার এক দুই বলব।"

রকিং চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পাছাটা দোলাচ্ছে সুব্রত চৌধুরী। সাপের মতো চোখ দিয়ে উপভোগ করছে কৃপানন্দবাবুর যন্ত্রণা। ভালো লাগছে। বেশ একটা তৃপ্তি। অফিসার হওয়ায় বেশ সুখ আছে। এরপর কৃপানন্দ তোমাকে দিয়ে তোমার মেয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাব। দেখে মনে হচ্ছে তুমি অরাজী হবে না।

নাকের পাশে, চোখে দুচার ফোঁটা থুতু ছিটকে লেগেছিল। একটা বিচ্ছিরি পচা পচা ঘ্রাণ। স্ট্রাইকের দুর্ভাবনায় নিশ্চয়ই তিনদিন দাঁতে বুরুশ ছোঁয়ায়নি। ন্যাষ্টি। মুখ মুছল সুব্রত চৌধুরী। রুমালে আর একবার ভালো করে মুখ মুছল। বিনতার বাড়ি যাবার আগে রুমালে দামী সেণ্ট ঢেলেছিল। ভাগ্যিস সেণ্টটা ঢেলেছিল রুমালে, নইলে বমি হয়ে যেত।

"উঁহু, হাত নামাবেন না। ধরে থাকুন। বেশ দেখাচ্ছে এখন আপনাকে। ইস্কুলের নিচু ক্লাসের ছোট্ট নটি বয়টি। এইবার আমি এক বলছি। রেডি, এ—ক—"

কৃপানন্দবাবু দাঁড়িয়েই রইলেন। শুধু একটু কেঁপে উঠলেন। অসহায় চোখে সুব্রত চৌধুরীর চোখের দিকে তাকালেন। সুব্রত চৌধুরী দৃষ্টি সরিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে চেয়ারের হাতল থেকে নামল।

"তা হলে মিঃ মুখার্জি, চাকরিটা খোয়াতে তোমার আপত্তি নেই—?"

কৃপানন্দবাবু কাঁপতে কাঁপতে বসলেন। দুপায়ের ওপর ভর রাখতে পারলেন না, টলে মাটিতে পাছা ঠেকিয়ে বসে পড়লেন, কান থেকে হাত খুলে গেল, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"রাইট্। ছাট্‌স্ লাইক এ গুড্ বয়। এদিকে সরে আসুন। আসুন। হুঁ। টেবিলের [illegible] ওপর ওখানে কি দেখতে পাচ্ছেন, ভালো করে হেঁট হয়ে দেখুন। আচ্ছা, এবার কান থেকে হাতটা নামাতে পারেন। চশমাটা পরেই দেখুন। বার করুন চশমা—"

কৃপানন্দবাবু চশমা বের করে পরলেন। টেবিলের ওপর ঝুঁকে দেখলেন। তারপর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"কি দেখলেন ওটা? বলুন?"

ভাঙা, ধরা, বসা, শুকনো গলায় প্রায় আওয়াজ বেরুল না। কৃপানন্দবাবু বলার চেষ্টা করলেন, "জলের মতো যেন কি।"

"জল নয়। ওটা থুতু। সীতা মুখার্জি আপনার কে হয়? জনমদুখিনী সীতা?" বিশেষণটা প্রয়োগ করতে পেরে উল্লাস বোধ করল চৌধুরী।

"আমার মেয়ে।"

"কদ্দিন চাকরি করছে এখানে?"

"বছর তিনেক।"

"তার চাকরিটা গেছে। আপনারটাও বোধহয় যাবে। আমি অবশ্য রাখবারই চেষ্টা করব। আপনার চরিত্র এবং আপনার মেয়ের চরিত্র হেভেন অ্যাণ্ড হেল তফাৎ। অমন মেয়ে আপনার কি করে হল? অত্যন্ত পাজি মেয়ে। মুখের ওপর থুতু ছুঁড়ে সে চাকরিটা খুইয়েছে, আপনারটাও প্রায় খতম করে গেছে।"

কৃপানন্দবাবু মাথা নিচু করে রইলেন।

ওই থুতুটা চেটে তুলে নিলে আপনার চাকরি থাকবে। এই আমার হাতে বণ্ড। বণ্ডটা আপনাকে দেব, চাটুন। ঘেন্নার কি আছে, ও তো আপনারই মেয়ে, ধরতে গেলে আপনার মুখেরই থুতু। আপনার থুতুতেই তৈরি।"

সুব্রত চৌধুরী আনন্দে পা দোলাচ্ছে। সীতা মুখার্জিকে প্রায় নিরামিষ প্রস্তাবই একটা দিয়েছিল। সীতা মুখার্জির নাগাল আর পাওয়া যাবে না। তার বাপ এখনও হাতের মুঠোয় আছে। লিস্টে সীতা মুখার্জির পর অন্য লোকের নাম ছিল। কেউটের বাচ্চাটা বাপকে বুঝিয়ে হাত করার আগেই সুব্রত চৌধুরী কৃপানন্দবাবুকে ডাকিয়েছে।

"আপনার মেয়ের এটুকু শিক্ষা থাকা উচিত ছিল যে টেবিলটা থুতু ফেলবার জায়গা নয়। আশা করি আপনি বাড়ি গিয়ে মেয়েকে কিছুটা সভ্যতা-ভদ্রতার তালিম দেবেন। আঃ, দেরি করবেন না। আপনাকে আমি জোর করছি না। হয় ওটা চেটে সাফ করুন—এই বণ্ড পেপার নিন, নয় ঘর ছেড়ে চলে যান, আপনার নামের পাশে আমি ঢেঁড়া টেনে দি।"

তুমি একদিন বলেছিলে তিরিশ বছর কেরানীর কাজ করছ। ইঞ্জিনীয়ারিং আর কেরানীর কাজ এক নয়। গাঙ্গুলির সামনে বলেছিলে। আশা করি, কেরানী হওয়ার জন্য আজ তোমার অনুতাপ হচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ার হতে পারলে—অবশ্য তোমার জন্মই তোমার ইঞ্জিনীয়ার হওয়ায় বাদ সেধেছে—কেমন সবাইকে মুঠোর মধ্যে পেতে, আরাম হত, আনন্দ হত। কৃপানন্দবাবু ঝুঁকছে না? হ্যাঁ, ঝুঁকছে। তা হলে দেখছি রাজী। উপায় কি?

সুব্রত চৌধুরী কোমরে ঝোলানো ক্যামেরাটা ঠিক করে নিল।

"গুড্"—সঙ্গে সঙ্গ 'ক্লিক্' করে একটু শব্দ হল। কৃপানন্দবাবু চমকে মাথা তুললেন। ঘরের চারপাশে তাকালেন। তাঁর কেমন ভয় হচ্ছে,

তৃতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই কেউ ঘটনাটা দেখেছে, যদিও তিনি জানেন ঘরে তৃতীয় কেউ নেই। সুব্রত চৌধুরী বণ্ড পেপারটা তাঁর হাতে দিল, "কালকে ভর্তি করে আনবেন। চাকরিটা যাতে থাকে দেখব।"

চাকরিটা রাখতে হবে কৃপানন্দবাবুর, কারণ তা হলেই সীতা মুখার্জিকে একদিন শায়েস্তা করার সুযোগটা থেকে যাবে।

"ভয় নেই, আপনার মেয়ে সীতা মুখার্জি ছাড়া ঘটনাটা আর কেউ জানবে না। সীতা মুখার্জির থুতু সীতা মুখার্জির পূজনীয় পিতৃদেব চাটছে এই ফটো দেখে আশা করি তার একটু শিক্ষা হবে। বাকিটা আপনি দিয়ে দেবেন। ডেভেলপ করিয়ে ফটোর একটা কপি আমি যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব।"

মৃত ব্যক্তির মতো কৃপানন্দবাবু তাকালেন সুব্রত চৌধুরীর দিকে, তিনি ঘটনাগুলো সঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না। কিছু তাঁর মাথায় ঢুকছে না। তিনি রেগে যেতে, অভিশাপ দিতে, কিছু একটা করতে ভুলে গেছেন। তাঁর মাথার মধ্যে শুধু একটা জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছে, সীতার চাকরি নেই, বিরাট একটা সংসার মাথার ওপর, রিটায়ার করার আর মাত্র কয়েক বছর বাকি। তিনি পরাজিত, এই মুহূর্তে কিছুই তাঁর করার নেই সই করা ছাড়া।

"যান।"

পেছন ফিরতে গিয়ে কৃপানন্দবাবু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে চাপা স্বরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সমস্ত পিঠটা জোয়ারের স্রোতের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আঃ, কিছু করার নেই।

"ডোণ্ট ক্রিয়েট এ সীন। উঠুন। বাইরে আপনার বন্ধুরা আছে। তারা শুনলে আশা করি আপনার সম্মান বাড়বে না। উঠুন। অযথা সময় নষ্ট করবেন না। গেট আপ্।"

কৃপানন্দবাবু উঠলেন, জামার হাতায় চোখ মুছলেন, মাথা নিচু করে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। সুব্রত চৌধুরীকে নয়, নিজেকেই তিনি বারংবার অভিশাপ দিলেন।

"তা হলে মিস্ মঞ্জু ব্যানার্জি, তুমি মাথা নিচু করে ফেরে এলে? তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আর রাস্তায় ধেই ধেই করে নেচে বেড়াতে পারলে না? তুমি।

আসবে আমি জানতুম, কারণ তোমার বাড়ির খবর, তোমার রুগ্ন বাবা, কাচ্চাবাচ্চা ভাইবোনের কথা জানিয়ে একটা লিফটের জন্য তুমিই আমাকে একবার মিনতি করেছিলে। লিফট তোমার হতো। কেন হয়নি, তা তুমি জানো। এখন তোমার চাকরিটা থাকবে কিনা ভাবছি। উঁহু, কেঁদ না, কেঁদে কোনো লাভ নেই। সুব্রত চৌধুরীকে তুমি চেনো। বড়োই খারাপ লোক। তোমার ভাগ্যের দোষে এখন তারই হাতে তোমার চাকরি, আর তুমি নির্বোধ নও, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, অ্যাভারেজ মেয়ের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী, সুন্দরীও। আমার একটা প্রস্তাব আছে, কেউ জানতে পারবে না, আশা করি, তোমার আপত্তি হবে না।”

মঞ্জু ব্যানার্জি টেবিলের কোনায় হাত রেখে টাল সামলাল। সুব্রত চৌধুরী বুড়ো কবিরাজের চোখ নিয়ে রোগিনীর দিকে তাকাল। না, সীতা মুখার্জি নয়।

“উঁহু, বোসো না। দাঁড়াও, দাঁড়িয়েই থাকো।”

দাঁড় করিয়ে রেখে তোমাকে ক্লান্ত, অবসন্ন করব। তোমার মনোবল তাতে ভাঙবে। তারপর, তোমাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নেওয়াই সহজ। সাপুড়ের মতো সুব্রত চৌধুরী মঞ্জু ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে আছে। ঘামে মুখ, কপাল, ব্লাউজের হাতা, চিবুক, গলা ভিজে গেছে। কপালে, গালে, কতগুলো চুল ঘামে লেপ্টে আছে। কাঁপছে। অজ্ঞান হয়ে না যায়।

“তা হলে তুমি চাকরিটা ছেড়ে দিতে রাজি ?”

“না, না—”মঞ্জু ব্যানার্জি শিউরে উঠল, “না, দয়া করে আমার চাকরিটা নষ্ট করবেন না, আপনার পায়ে পড়ি—”

“জানতুম, তুমি এ কথা বলবে, কারণ তুমি নির্বোধ নও। কিন্তু পায়ে—না, অত নিচে তোমাকে নামতে হবে না।”

“কি চান, কি চান আপনি আমার কাছে ?”

“আমি ?” সুব্রত চৌধুরী হাসল, “না, আমি কিছুই চাই না। এই বিভাগ, যেখানে তুমি চাকরি করো, সে তোমার কাছে কিছু অবশ্যই চায়। সে চায় সেই বিভাগকে তুমি খুশি করবে। আর তুমি জানো, কাগজেও আজ দেখেছো, বিভাগের সর্বেসর্বা প্রতিভূ এখন আমরা, আমি। বিভাগকে খুশি করার অর্থ এখন আমাকেই খুশি করা, নয় কি ?”

মঞ্জু ব্যানার্জি সুব্রত চৌধুরীর চোখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল। সুব্রত চৌধুরী রকিং চেয়ারের হাতলের ওপর বসে পাছা দোলাচ্ছে। ক্যামেরাটা নাড়াচাড়া করছে, মৃদু হাসছে। একদিন এই মঞ্জু ব্যানার্জি, তার মনে পড়ল, নাক ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিল। বলেছিল, ফের যদি আপনি আমাকে এমন কথা বলেন, আমি সকলকে জানাব। তখন সেন্ট্রাল ছিল সবার ওপর, দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। সুবিধে মতো জোট বেঁধে যা খুশি তাই বলে, তুমি, তোমরা, সবাই পার পেয়েছ। তুমি, তোমার ঐ বন্ধুরা সবাই কৃমির কীটের মতো, অতি নগণ্য সামান্য কর্মচারী। তোমাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলা অপমানজনক, মানহানিকর, কেননা আমি, চৌধুরী, মানে আমরা, যাদের—অর্থ এবং মেয়েই পরম ও চূড়ান্ত দর্শন, তারা অপ্রকাশ্যে অন্ধকারেই ওটা সারতে চাই। আর ঈশ্বরের কী কুরুচি—তোমরা এই কীটেরা মেয়েমানুষ। সেই অসার দম্ভে তখন ফণা তুলেছ। কিন্তু আজ ? আজ আমিই অথরিটি। আজ তুমি একথা কাউকে জানাতে পারবে না, জানালেও কেউ শুনবে না, তোমাদের জোট এখন ভেঙে গেছে। আর সেন্ট্রাল ? হা হা, তোমার নামে একটি রিপোর্টেই তোমার চাকরি নষ্ট হবে, কারণ, তোমরা আইন অমান্য করে বে-আইনী স্ট্রাইক করেছ। আদালতও তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

“বলো, তোমার অফিসকে তুমি খুশি করবে ?”

“কি ভাবে, বলুন”—আবার কাঁদছে মঞ্জু ব্যানার্জি। আমরা হেরে গেছি। পরাজিতের ওপর বিজয়ীর জিঘাংসা। সব যুগেই হয়েছে, আজও হচ্ছে। ঈশ্বর সাক্ষী, সুব্রত চৌধুরী, একদিন তুমিও হারবে, তুমি, তোমরা, তোমাকে এই অত্যাচারের অধিকার যারা দিয়েছে—তারা, সবাই, তোমাদের সবাই। এই কথাগুলি ভেবেও মঞ্জুর দুঃখ হল না। সে হাসতে পারল না। শুধু একটা করুণ ভঙ্গি করল, যার অর্থ, আজ আমাকে দয়া করুন।

“দ্যাট্‌স্ লাইক এ গুড গার্ল” সুব্রত চৌধুরী চেয়ারের হাতল থেকে নেমে দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। হাসছে অর্থপূর্ণ চোখে, “জানতুম, তুমি রাজি হবে, কারণ তোমার বুদ্ধি আছে, গোঁয়ার্তুমির কোনো মানে হয় না। তোমাকে আমি যেমন কিছু দিচ্ছি, চাকরিটা দিচ্ছি, তোমাকে খুশি করছি, তেমনি তুমি আমাকে করবে—রেসিপ্রোকাল, দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে, বিজনেস্। সবই বলব। ধীরে ধীরে বলব, তাড়ার কিছু নেই। এই নাও, তোমার বণ্ড পেপার। সই করে, ফিলআপ করে, কাল ফেরৎ দিয়ে যাবে। তার আগে,

তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তোমার একটা ফটো নেব। এটা খুব ভাল ক্যামেরা, আজই সারিয়ে এনেছি, অন্ধকারেও ছবি ওঠে, কেউ জানবে না। তোমার ছবি নিতে চাইছি, কারণ তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে। নেব ?"

একটা বেড়াল ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করছে। থাবা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, উলটিয়ে পালটিয়ে দেখছে।

"নিন্—"

এইবার চরম মুহূর্ত। সীতা মুখার্জির ঘটনাটা মনে পড়ল। সুব্রত চৌধুরী ঘেমে উঠল। ভাগ্যিস মঞ্জু ব্যানার্জি মাটির দিকে চোখ করে আছে, দেখতে পাবে না। মঞ্জু ব্যানার্জি অবশ্য সীতা মুখার্জি নয়, কারণ তা হলে এর আগেই থুতুটা ছিটকে এসে চোখে, ঠোঁটের কোণে, নাকের পাশে লাগত, বাকিটা টেবিলে পড়ত। তবু পা তিনেক পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখল, ক্যামেরাটা তুলল। বললে, "মিস্ ব্যানার্জি, তোমার সাধারণ ফটো আমার কাছে ডজন কয়েক আছে, মানে, তোমার অজ্ঞাতসারেই আমি তুলেছি। এখন যদি কিছু মনে না করো, যদি দয়া করে অনুমতি দাও, তোমার খালি গায়ের একটা ছবি নেব।"

"না, না, পারব না, আমি পারব না"—চকিতে মঞ্জু ব্যানার্জি ঘুরে দাঁড়াল। বাহুর ভাঁজে চোখ ঢাকল। কাঁদছে। কাঁদবেই তো; রাইট। এই কান্নাটা, এই প্রতিরোধ, ওর এই অনিচ্ছুক যন্ত্রণা উপভোগ্য। সুন্দর। এটা না থাকলে নারীত্ব কিছু না, তোমাকে ভালো লাগত না। তুমি ফেরাও, তাই তুমি টানো। নতুবা আমি ফেলে দিতুম নিজেই। "নাউ ওপন্, আন্-বাট্‌ন্ দ্যাট্—"

না, থুতু ছিটকে আসেনি। জানতুম আসবে না। কারণ সবাই সীতা মুখার্জি নয়। একে দিয়ে এখন যা খুশি তাই আমি করিয়ে নিতে পারি, কারণ, ওর আত্মবিশ্বাস ভেঙেছে, ভয়ে, আতঙ্কে এখন ও চূড়ান্তভাবে নিজেকে অসহায় বোধ করছে। মঞ্জু ব্যানার্জি এখন কথা শুনবে, বেশ কিছুদিন শুনবে, সব কিছুই করবে, কারণ বাঁচাটাই এখন ওর কাছে বড়ো কথা। গোঁয়াতুমি দিয়ে সীতা মুখার্জির মতো ও আত্মহত্যা করতে চায় না, বাঁচতে চায়। নইলে—

সুব্রত চৌধুরী হাসল, গলাটা মোলায়েম করল, গলায় স্নেহ ঢেলে দিয়ে বললে, "পারবে, খুব পারবে। আমি একটু সাহায্য করব ?"

এক পা এগিয়ে এল সুব্রত চৌধুরী, আতঙ্কে দু পা পেছিয়ে গেল মঞ্জু ব্যানার্জি, "না, না—দাঁড়ান—"

এক হাতে চোখ ঢাকল। কম্পিত, শিহরিত অন্য হাতের আঙুল ছুঁইয়ে, নখ বসিয়ে বোতামটা টান দিয়ে ছিঁড়ল। আঃ, ঈশ্বর।

"মুখ থেকে হাত নামাও। নামাও। উঁহু, চোখ বুঁজে থাকলে হয় না, মঞ্জু—আমার মঞ্জুরানী! তাকাও বলছি, তাকাও, লুক ইনটু মাই আইজ—ওক্-কে—এই তো। হোয়াট এ বিউটি—দি লাভলিয়েস্ট থিং অন আর্থ—।" আর দাঁত কিড়মিড় করে মনে মনে বলল, কেমন লাগছে, মঞ্জু ব্যানার্জি ? সাধ মিটেছে স্ট্রাইকের ? 'বস' খুশি হবে, বিভাগে আমার উন্নতি হবে। আর, এই পদ্মকলি ফটো দেখিয়ে তোমাকে চিরদিন ব্ল্যাকমেল করব।

সব শুনে রাণুর মনটা খারাপ হয়ে গেল, ঘৃণায় শরীরটা রি রি করে কেমন বমি বমি ঠেকল, কান্না পেল। নিজের হাতটা তার কামড়াতে ইচ্ছে করল। ইচ্ছে হল, একটা ছুরি হাতের তালুর ওপর বসিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের করে দেয়, তা হলে বুঝি শরীর একটু শান্ত হয়, শীতল হয়। এই—এই হয়। অপদার্থ একক হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতার এই চূড়ান্ত বিকৃতিই অনিবার্য। বিকৃতি, বিকৃতি। ওদের এই সভ্যতা, সমাজ, অর্থনীতি, তার বশম্বদ অনুচর—সব একটা বিকৃতি। পাকাটে ডালিম ছিল, এখন পচা, এই অফিসারগুলো সেই পচা ডালিমের এক একটা বীচি।

"তোদের সুব্রামনিয়াম কী বললে ?"

"এখনও বলে নি কিছু, বণ্ডটা সই করে আনতে বলল। ইউনিয়নের কয়েকজনকে অবশ্য বণ্ড দেয় নি। এখনও শুরু করে নি, গভীর জলের মাছ।"

"আমাদের খিদিরপুরের মিঃ খারেকেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, চুপচাপই আছে। একটু ভয় পেয়েছে মনে হয়। তবে, যাই বলিস, ডালহৌসির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার সুব্রত চৌধুরীর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। ইউনিয়ন থেকে দিল্লিতে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, নিউজ পেপারেও ঘটনা সব জানানো হয়েছে। তারপর আরও কি করেছে শোন—"

বলে শীলা রাণুর মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে কি বলল। পচা ডালিমের এক একটি অসার বীচি—রাণুর আবার মনে পড়ল কথাটা।

শীলা থুঃ করে একদলা থুতু ফেলল। বললে, "তুই দেখিস নি রক্ষে। দেখলে কিন্তু সুব্রত চৌধুরীকে অমনটি মনে হয় না মোটেই, যেন কত সাধু

পুরুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। একেম্বরের বদমাইস, ছোটলোক। ওর আণ্ডারে থাকলে চাকরিটা ছাড়তেই হত। কিন্তু যাই বলিস, চেহারাখানা ডন জুয়ান। তোর সঙ্গে যা মানাত না—!"

"আঃ, কী যে বাজে রসিকতা শিখেছিস—"

মাথটা ঘুরছিল রাণুর। বমি আসছিল, কান্না-কান্না, রাগ, হিংস্রতা—সব মিলিয়ে একটা অনুভূতি ওকে কম্পিত করছিল, বিবর্ণ করছিল।

"কিরে, কি হল ?"

"এক গ্লাস জল খাওয়া, বাড়ি যাব। বাড়ি থেকে ওগুলো নিয়ে আসি।"

"আয়। সঙ্গে যাব আমি ?"

"না। সুটকেসটা নিয়ে আসি, এখুনি আসব। যদ্দিন সিট না পাচ্ছি তোর সিটেই ভাগাভাগি করে থাকব। তুই-ই যখন সুপারিনটেনডেণ্ট তখন—"

"আয়। হবেই একটা কিছু ব্যবস্থা। কিন্তু হঠাৎ ? কারণটা তো বললি না বাড়ি ছাড়ার ?"

"বলব, এসে বলব।"

সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় রাণুর দু চোখ ফেটে জল এল। মাকে জানায় নি। মা শুয়েছেন। চুপি চুপি নিজের ঘর থেকে সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঝি দেখেছে, কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় নি, একটু অবাক চোখে তাকিয়েছে, রাণু হেসেছে, যেন একটা সাধারণ ব্যাপার। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার চোখ উপচে জল পড়ল। এই বাড়িকে এই মুহূর্তে সে ঘৃণা করছে, আবার ছেড়ে যেতে কষ্টও হচ্ছে। মার জন্য কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে, কোথায় কোন্ অজানা সমুদ্র সে এবার পাড়ি দিতে চলেছে। একটা সান্ত্বনা, সেটা সমুদ্রই, পঙ্কিল ডোবা কি পুকুর নয়।

প্যাসেজে সুব্রতর সঙ্গে দেখা। দূর থেকে দেখেই চোখ মুছেছিল রাণু। সুব্রত শিস দিতে দিতে ফিরছিল। মনটা খুশি খুশি। খুশি হবার কথাই। যুদ্ধে জয়ী বীরের মতো সে ফিরছে। ফটোটা এখুনি ডেভেলপ করতে হবে। গাঙ্গুলিকে এক কপি দেব, হেঃ হেঃ। বাক্কোৎ গলে যাবে। না, দেব না। হ্যাঁ দেব, না, দেব না। বিনতা। পুরী। ছুটি নেব।

"একি, কোথায় ?"

"হোস্টেলে। এ বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। ভালোই হয়েছে, দেখা হল। সব কিছু রেখে যাচ্ছি। শুধু এই সুটকেসটা—আমারই কেনা—"

"অ। চাকরিটা তাহলে আছে ? আশ্চর্য, কি করে থাকল ?"

"বাঃ, থাকবে না কেন ?" জোর করে হাসার এবার চেষ্টা করল রাণু, হাসলও, খুব খুশি, খুব আনন্দিত, বিজয়ীর মতো মুখভঙ্গি করে, মাটিতে পা ঠুকে তাল দিতে দিতে।

সুব্রত চৌধুরী ভয় পেল। সন্দিগ্ধ চোখে, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে, মুখে গর্বোদ্ধত ভাব রেখেই তাকাল রাণুর দিকে। ভয় দেখাচ্ছে ? না, ভয় দেখাচ্ছে না। নিজেকে কেমন অসহায় বোধ হচ্ছে। মনে হল বলে, ছেলেমানুষী রাখো রাণু, পাগলামির একটা সীমা আছে। বলতে পারল না, অহঙ্কারে বাধছে। আঘাতেরও ভয় আছে।

"সুব্রামনিয়াম কিছু বলল না ? কিছুই না ?"

"কি আবার বলবে ?"

তারপর চকিতে, একমুহূর্তে কি যেন মনে পড়ে গেল। বললে, "ও হ্যাঁ। শুধু একটা ফটো নিয়েছে—নেকেড, স্টার্ক নেকেড, মানে—একেবারে নগ্ন।"

থেমে, চিবিয়ে, প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে ওজন করা হিসেবী কথাগুলো শেষ করে সুব্রতর মুখের দিকে রাণু তাকাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, একটা জটিল অপারেশন শেষ করে একমুহূর্ত যেমন ডাক্তার তাকায় রোগীর মুখের দিকে। সুব্রতর মুখ ফ্যাকাশে, রক্তহীন। রাণুর মনে হল, সুব্রত পড়ে যাচ্ছে। পড়বেই। সুব্রত একদিন পড়তই। তবু রাণুর কষ্ট হল, ওর দাদা সুব্রত, যে নিজেরই মায়ের পেটের ভাই, একই রক্ত, তবু, জাতে কত আলাদা—তা হোক, ওকে, এই ক্রম-নিঃসঙ্গ সুব্রতকে আঘাত দিতে, তারপর সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়া বৈজ্ঞানিকের স্থির অবিচল দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে রাণুর বুক চৌচির হয়ে ফেটে পড়তে চাইল।

নিঃসঙ্গ দাদার মুখের দিকে শেষবার তাকাল রাণু। তারপর চোখের জল হাত দিয়ে সরিয়ে, শান্ত নম্র পায়ে গেট পার হল। একটা অচেনা উদ্বেগে, নির্মম আঘাত দেওয়ার রূঢ় ব্যথায় এবং মুক্তির সুতীব্র যন্ত্রণামুখর আনন্দে রাণু কেঁপে উঠল। একটি মুহূর্ত। পরক্ষণে দ্রুত পা ফেলল। মনে হল, একটা ভূতুড়ে দমবন্ধ শ্মশান পার হয়ে সে জীবনের দিকে ছুটছে, যেখানে তার বন্ধুরা সবাই অপেক্ষা করছে।

একটি যুদ্ধের ইতিহাস

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

অনন্ত
অসীম
প্রথম
দ্বিতীয়
তৃতীয়
চতুর্থ
সুলতা
দণ্ডধর
মলিনা
বিচারক
মুনশী
আরও দু-একজন
এবং অসংখ্য লোক

এই নাটিকার অভিনয় নাট্যকারের অনুমতি সাপেক্ষ

যবনিকা সরে যাওয়ার আগে

কণ্ঠস্বর। সমন্তপঞ্চকে সেই ভীষণ গদাযুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে দুই পক্ষ। এক পক্ষ ভীম, আর এক পক্ষ দুর্যোধন। সে যুদ্ধের কারণ ছিল—মহাকাব্যের কারণ। তারপর যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। কারণ হয়ে উঠেছে জটিল। যুদ্ধের পদ্ধতি ? সে যেন আরও জটিল। নাই বা বললাম সে কারণের ইতিহাস। যুদ্ধের কথাটাই হোক।

যবনিকা সরে যায়

চেয়ার, টেবিল, অনন্ত

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) কে ওখানে ?

অসীম। (প্রবেশ করিয়া টেবিলের নিকট আসে) আমি। অসীম।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) তারপর কি মনে করে ?

অসীম। কথাটা তোমার ঠিক নয়।

অনন্ত। কেন ? (যেমন কাজ করিতেছিল তেমনই কাজ করিয়া যায়)

অসীম। কেন আবার কি। ঠিক নয়।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) তবে কোন্‌টা ঠিক ?

অসীম। প্রতিবাদে যে কথাটা বলা হল সেইটে।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) আমি তা মানি না।

অসীম। মানি না বললেই চলে কি ? মানতে হয়।

অনন্ত। (মুখ তুলিয়া) মানলুম না। (পুনরায় কাজে মন দেয়)

অসীম। কেন মানবে না শুনি ?

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) আমি যে কথাটা বলেছি, সেটা আমার মত বলে।

অসীম। লোকে যে মতটা মানে সেটা বলে না।

অনন্ত। আমি কিন্তু বলি।

অসীম। (দশ টাকার নোট বাহির করিয়া) তা হলে দশটা টাকা দিই ?

অনন্ত। কেন ?

অসীম। তোমার ঐ মতটার দাম।

অনন্ত। (কাজ করিতে করিতে) ওটা তোমায় এমনি দিলাম। তুমি ব্যবহার করতে পারো।

অসীম। ভেবে দেখ। দামটা আমি বাড়াচ্ছি—কুড়ি…তিরিশ…পঞ্চাশ…

এপাশ-ওপাশ হইতে কয়েকজনের প্রবেশ

প্রথম । নীলাম হচ্ছে না কি ?
অসীম । হ্যাঁ। (অনন্তর কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কাজ করিয়া চলিয়াছে)
দ্বিতীয় । কিসের ?
অসীম । ওঁর একটা মত আছে, সেইটের।
তৃতীয় । মত ? জিনিসটা কি রকম ?
অসীম । শুনতেও ভালো—বলতেও ভালো।
চতুর্থ । তাই না কি ! তা হলে একটা দাম দিই ?
অসীম । দিতে পারো। (অনন্ত একমনে কাজ করিতেছে)
তৃতীয় । বিড্ কত যাচ্ছে ?
অসীম । পঞ্চাশ।
দ্বিতীয় । বেশ। আমার একটা রইল। ষাট।
প্রথম । সত্তর।
চতুর্থ । আশি।
তৃতীয় । নব্বুই।
দ্বিতীয় । একশো।
অসীম । দুশো। (অনন্ত নিজের কাজ করিতেছে)
প্রথম । তিনশো।
চতুর্থ । পাঁচশো।
তৃতীয় । সাতশো।
দ্বিতীয় । নশো।
প্রথম । হাজার।
অসীম । সুলতা বলছিল তোমার নাকি ওদেশে যাবার খুব ইচ্ছে।
অনন্ত । (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) তুমি সুলতাকে চিনলে কি করে ?
অসীম । সুলতা টিউশানির মাইনে পায় নি। তাই ঘর ভাড়ার টাকাটা তোমার কাছে চেয়েছিল।
অনন্ত । (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তুমি সুলতাকে চিনলে কি করে ?
অসীম । টাকাটা তুমি যোগাড় করতে পারো নি। তাই আর যাও নি।
অনন্ত । (প্রায় চিৎকার করিয়া) তুমি এত কথা জানলে কি করে।
অসীম । ঘর ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছি কি না, তাই।

অনন্ত । তাইতেই সে তোমাকে সব বলে দিল ?
অসীম । এক দিনে তো বলে নি। সাতদিনে বলেছে। আমার যাতায়াত তো রোজ। (অনন্ত বসিয়া আবার কাজ করিতে আরম্ভ করে)
চতুর্থ । নীলাম কি বন্ধ হয়ে গেল ?
অসীম । না না, কে বললে ? শোনো তোমার ওদেশ যাওয়ার খরচা আমি দেব।
তৃতীয় । যাওয়ার খরচা, থাকা-খাওয়ার খরচা—দুটোই আমার।
দ্বিতীয় । ওর ওপর ফিরে আসার খরচাও ধরে দেব।
প্রথম । বোঝার ওপর শাকের আঁটি। ওটা তো দেবই—তার ওপর হাত-খরচা।
চতুর্থ । ওসব তো আছেই। তাছাড়া পুরো জেট-প্লেনখানা ছেড়ে রেখে দেব। যখন খুশি নিয়ে যাবে, যখন খুশি নিয়ে আসবে।
অসীম । ভেবে দেখ—যখন খুশি নিয়ে যাবে, যখন খুশি নিয়ে আসবে।
অনন্ত । (কাজ করিতে করিতে) আমি বেশ্যা নই। নিজেকে বিক্রি করি না।
অসীম । মলিনা কিন্তু করে।
অনন্ত । (মুখ তুলিয়া) কে করে ?
অসীম । মলিনা।
অনন্ত । (কণ্ঠস্বরে যেন শাপ দেওয়া। উঠিয়া) তুমি গোয়েন্দা—না হিতাকাঙ্ক্ষী ?
অসীম । তোমার পরিবার ? ধ্বংস তার অনিবার্য। আর তুমি ? আজ বাদে কাল শেষ হয়ে যাবে।
অনন্ত । তুমি যেতে পার। আমি তোমাকে চিনি না।
অসীম । চেনার তো কোনো দরকার নেই। আমি খদ্দের।
প্রথম । ঠিক কথা। খদ্দেরকে তো না চিনলেও চলে।
দ্বিতীয় । নিশ্চয়। সব ব্যবসাদার কি সব খদ্দেরকে চেনে ?
তৃতীয় । তবু তো বেচাকেনা চলে।
চতুর্থ । তবু তো ব্যবসা এগোয়।
অসীম । তাই তো বলছি—মতামতটা বিক্রি করে দাও, আমরা চলে যাই।
অনন্ত । সুলতা এখন কোথায় ?
অসীম । এ-কদিন আমার ফ্ল্যাটে ছিল। এখন এখানে।

স্থলতার প্রবেশ

স্থলতা। (অসীমকে) বাঃ বেশ লোক যা হোক ! এই আসছি বলে ঢুকলে—আর বেরবার নাম নেই। কেমন আছ অনন্ত ?

অনন্ত। তুমি কি এদের সঙ্গে এসেছ।

স্থলতা। হ্যাঁ পরিচিত বন্ধুবান্ধব লোক। বললেন, চল ঘুরে আসি।

অনন্ত। কত দিনের পরিচয় ?

স্থলতা। এই তো—দিন সাতেক।

অনন্ত। আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

স্থলতা। তোমার চিঠি যখন হাতে এল তখন কোটির এই ফেস্‌-পাউডারটা মুখে লাগিয়ে দেখছি কেমন দেখায়।

অনন্ত। ও, চিঠি পৌছবার আগেই এদের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে ?

স্থলতা। হ্যাঁ, ততক্ষণে চার মাসের বাড়ি ভাড়া মিটে গেছে। ভালো হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার পথে অনেক দিনের পছন্দ করা কখানা শাড়ি কিনে এনেছি। নিউ এম্পায়ারে যাব ছবি দেখতে। তৈরি হচ্ছি—এক হাতে কোটির ফেস পাউডার—এমন সময় আর এক হাতে এল তোমার চিঠি, আমাদের সেই পুরনো বাড়ি ঘুরে।

অনন্ত। চিঠিটা তুমি পড় নি স্থলতা ?

স্থলতা। পড়েছিলাম অনন্ত।

অনন্ত। তবে ?

স্থলতা। শুনলে তুমি দুঃখ পাবে অনন্ত।

অনন্ত। বলো না শুনি।

স্থলতা। পড়েছিলাম, কিন্তু কিছু মনে হয় নি।

অনন্ত। কিন্তু কেমন করে জানলে একথাটা শুনে আমার দুঃখ হবে ?

স্থলতা। দুঃখ তোমার হয়নি অনন্ত ?

অনন্ত। হয়েছে, কিন্তু তুমি কি করে জানলে ?

স্থলতা। সত্যিই তো, আমি কি করে জানলাম ?

অনন্ত। তুমি আবার আমার চিঠিটা পড়ে দেখো স্থলতা।

স্থলতা। কিন্তু চিঠিটা তো হারিয়ে গেছে।

অনন্ত। চিঠিটা আমার মুখস্থ আছে—বলব স্থলতা ?

অসীম। বাজে কথায় কাজ কি। মতামতটা বিক্রি করে দাও—আমরা চলে যাই।

অনন্ত। টাকা আমি যোগাড় করেছিলাম স্থলতা। এই দেখ টাকা। কাজটুক শেষ করেই নিয়ে যেতাম।

স্থলতা। জানলে অনন্ত—ছোট বেলায় আমার চীনে লণ্ঠন কেনার খুব সখ ছিল।

প্রথম। চীনে লণ্ঠন ?

স্থলতা। হ্যাঁ, চীনে লণ্ঠন। কেমন যেন মনে হত চীনে লণ্ঠনের আলোয় সব বদলে যায়। সব কিছু স্থন্দর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়। সত্যি হয় নাকি ?

স্থলতা। একবার যেন হয়েছিল। খুব ছোটবেলায়—

তৃতীয়। তাই নাকি ? কি হয়েছিল ?

স্থলতা। নকুড় মিস্ত্রীর ছেলেকে চীনে লণ্ঠনের আলোয় দেখেছিলাম।

চতুর্থ। কি রকম মনে হল ?

স্থলতা। মনে হল—কেমন যেন রাজপুত্র—রূপকথার রাজপুত্র।

অসীম। তারপর একদিন সত্যিই চীনে লণ্ঠন কিনলে, তাই না।

স্থলতা। হ্যাঁ, একদিন চীনে লণ্ঠন কিনে ঘর সাজালাম।

অনন্ত। কিন্তু ছোটবেলার সে আলো আর আসে নি।

স্থলতা। না, সত্যিই আসে নি অনন্ত। ভাঙ্গা ঘর কেমন যেন আরও ভাঙ্গা দেখাতে লাগল—আরও বিশ্রী।

অনন্ত। আমিও তো তাই বলছি স্থলতা। ও চীনে লণ্ঠনের—

অসীম। তোমার ঐ বলার দাম কত ?

প্রথম। একশো ?

দ্বিতীয়। দুশো ?

তৃতীয়। তিনশো ?

চতুর্থ। চারশো ?

অনন্ত। বলেছি তো তোমাদের আমি চিনি না।

স্থলতা। কিন্তু সত্যি অনন্ত, তোমার ও বলার আর কোনো দাম নেই।

অনন্ত। কি বলছ স্থলতা ! এই তো সেদিন—

স্থলতা। সেদিন পর্যন্ত তো দাম ছিল অনন্ত। কিন্তু তারপর—

অনন্ত । হ্যাঁ—তারপর স্থলতা…?

অসীম । তারপর দিন সাতেক আগে হঠাৎ দামটা হারিয়ে গেল।

স্থলতা। হ্যাঁ—ঠিক সাতদিন আগে—

অনন্ত । কিন্তু স্থলতা—আমি চিঠিতে লিখেছিলাম—

স্থলতা। তখনও চিঠির কথা আসে নি অনন্ত—তোমার কথাই আছে। বাড়িওলা সবে তাগাদা দিয়ে গেছে—তোমাকে খবর পাঠিয়েছি—এমন সময়—

অসীম । এমন সময় চীনে লণ্ঠনের আলোয় সব যেন কেমন বদলে গেল।

প্রথম । একশো চীনে লণ্ঠনের দাম কত?

দ্বিতীয়। কত আর হবে—হাজার—

তৃতীয় । তাহলে আমাদের ব্যবসাটা—

চতুর্থ । ঠিক। ব্যবসাটা আমাদের চীনে লণ্ঠন দিয়ে সাজিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

অনন্ত । স্থলতা…!

স্থলতা। সত্যি বলছি অনন্ত—বিশ্বাস করো। ছোটবেলার সেই চীনে লণ্ঠনের আলোটা হঠাৎ যেন ফিরে এসে সব কিছুকে পালটে দিয়ে গেল।

অনন্ত । তুমি বাইরে অপেক্ষা করো স্থলতা। আমি এদের তাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

স্থলতা। কিন্তু, তুমি তো চীনে লণ্ঠন নিয়ে আসবে না অনন্ত।

অনন্ত । না স্থলতা, আমাদের পথ সূর্যের আলোর পথ। সে পথে তো চীনে লণ্ঠনের দরকার নেই।

স্থলতা। কিন্তু অনন্ত, বাড়িওলা বাড়ি থেকে বার করে দেবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল। বললে জল বন্ধ করে দেব, আলো বন্ধ করে দেব। তোমাকে চিঠি লিখে একা ভাবছি। হঠাৎ তোমার ঐ সূর্যের আলোর পথে বাবাকে দেখলাম। মরবার আগে পর্যন্ত পাওনাদারের তাগাদা পেছনে নিয়ে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে বাবা অফিস করেছেন। মা অভাবের জালায় বিশ্রী মুখ করে বিশ্রী কথাবার্তা বলে গেছেন। আর আমি? আমি নাকি ফোটা ফুলের মতো জন্মেছিলাম। কিন্তু সেই ফোটা ফুলের চেহারা নিয়ে দিনের পর দিন তোমার ঐ সূর্যের পথে ক্লেদাক্ত ঘর্মাক্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।

অসীম । তাই তো চীনে লণ্ঠনের আলো নিয়ে এলাম।

প্রথম । একশো—

দ্বিতীয়। দুশো—

তৃতীয়। তিনশো—

চতুর্থ । চারশো চীনে লণ্ঠনের আলো।

স্থলতা। আর জানলে অনন্ত? সে আলোয় নীতি, মত, পথ, আমার ঘাম-ঝরা দিন, কালি-পড়া রাত, আর সেই সঙ্গে তুমি, সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

অনন্ত । কিন্তু স্থলতা—আমি তো ভাবতেও পারি নি—নকল আলোর আলোয় এমনি করে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

প্রথম । তবে? কি তুমি ভেবেছিলে শুনি?

দ্বিতীয়। তুমি কি ভেবেছিলে রাতের পর রাত স্থলতা একা কাটিয়ে দেবে?

তৃতীয়। তুমি কি ভেবেছিলে বিছানায় স্থলতার পাশে শোবার মতো লোক তুমি ছাড়া আর কেউ নেই?

চতুর্থ । তুমি জানতে না অসীম আছে? জানতে না তুমি, অসীম না থাকলে আমরা আছি?

অসীম। তুমি কি ভেবেছিলে স্বর্গ থেকে নেমে আসা স্থলতা এখনও মর্ত্যের মাটিতে পা দেয় নি?

অনন্ত । আমি এটাকে সভ্য শহর বলেই জানতাম। কিন্তু এ তো দেখছি জঙ্গল।

প্রথম । গতিক কিন্তু সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ—আমারও কেমন মনে হচ্ছে—অনন্ত যেন পালাবার মতলব করছে।

তৃতীয়। পালালেই হলো। পালিয়ে একবার দেখুক না।

চতুর্থ । আমি আছি কি করতে? চোট করে দেব না।

অসীম। কি দরকার চোট করে দেবার। মতামতটা বিক্রি করে দাও—আমরা সবাই চলে যাই।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, চতুর্থ। (একসঙ্গে) কি আছে? বিক্রি করে দাও না? আমরা সবাই চলে যাই।

অনন্ত। আশ্চর্য স্থলতা! আমি তো এতদিনেও কিছু জানতে পারি নি। এরা তো দেখছি সাতদিনে সব কিছু জেনে ফেলেছে।

সুলতা। জানবে না কেন? অসীমকে যে আমি সব বললাম।

অনন্ত। আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলনি। অন্তত এই সব ভাবনার কথা।

সুলতা। তোমার সঙ্গে আমার শেষ যেদিন দেখা হয়েছে, সেদিনও তো বলার মতো অবস্থায় এসে পৌঁছুই নি। বাড়িওলা যখন তাগাদা দিয়ে চলে গেল, ভাবনা আরম্ভ হল তখন। তারপর এল অসীম। মনে হল এই হয়তো সুযোগ। ঘাম-ঝরা দিন, আর চোখে-কালি-পড়া রাতের এবার হয়তো শেষ।

অসীম। সুলতা বুদ্ধিমতীর মতো ভেবেছে অনন্ত। তুমিও বুদ্ধিমানের মতো ভাবতে আরম্ভ করো। আমাদের বুদ্ধি একটা নেবে অনন্ত?

দ্বিতীয়। আমাদের সঙ্গে একটু বাইরে যাবে? বারে?

তৃতীয়। ভালো মাল···দু পেগ টেনে আসবে?

চতুর্থ। মাথা দেখবে একেবারে সাফ হয়ে গেছে? আসবে আমাদের সঙ্গে?

অনন্ত। এরা তো তাড়ালেও যাবে না সুলতা। চলো আমরাই যাই।

সুলতা। এই সাতদিনের পরও একথা বলতে পারছ অনন্ত!

অনন্ত। কেন পারব না। আমি তো ও-সাতদিনের কথাটা বুঝি!

অসীম। বোঝ বলেই তো বলছি। মতামতটা বিক্রি করে দাও।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, চতুর্থ। (একসঙ্গে) আমরা হিসেব মিটিয়ে চলে যাই।

অনন্ত। আজ আটদিনের দিন আমরা নতুন করে দিন আরম্ভ করব সুলতা।

সুলতা। চলো অসীম, আমরা এখান থেকে যাই। এ লোকটা মদ না খেয়েও মাতাল।

অনন্ত। কিন্তু তোমার ও-ঘাম-ঝরা দিনের কথা আমি বুঝি সুলতা। বিশ্বাস করো—তোমার ও-চোখে-কালি-পড়া রাতের অনুভব আমার অন্তরে।

সুলতা। কিন্তু তোমার অনুভবকে আমার তো বইবার ক্ষমতা নেই অনন্ত। তোমরা আসবে না অসীম?

অসীম। শুনলে তো সুলতার কথা। অন্তত অনুভবটাকে বিক্রি করে দাও।

প্রথম ও দ্বিতীয়। (একসঙ্গে) ঠিক কথা। অন্তত অনুভবটাকে বিক্রি করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ। (একসঙ্গে) সঙ্গে সঙ্গে মতামতটাও বিক্রি হয়ে যাবে।

দণ্ডধরের প্রবেশ

দণ্ডধর। (প্রবেশ করিতে করিতে) কিসের ব্যবসা? কিসের বেচাকেনা? (প্রবেশ করিয়া অসীমকে দেখিয়া) এ কি, হুজুর?

অসীম। হ্যাঁ দণ্ডধর, আমি।

দণ্ডধর। গরীবের ব্যবসায় আপনি হুজুর?

অসীম। হ্যাঁ দণ্ডধর। কিছু কিনতে এলাম।

দণ্ডধর। কি বলছেন হুজুর! আপনি এলেন কিনতে আমার ব্যবসায়? (অনন্তকে দেখাইয়া) বলেছেন এঁকে?

অসীম। বলেছিলাম। উনি বেচতে রাজি নন।

দণ্ডধর। কি এমন জিনিস অনন্তবাবু যে হুজুরকেও বেচতে রাজি নন?

অসীম। ওঁর একটা মত আছে—আমরা সেটা কিনতে চেয়েছি।

দণ্ডধর। কিন্তু অনন্তবাবু, আপনি বোধহয় জানেন না, একটু আগে আমার মতটা আমি ওঁদের বেচে দিয়েছি।

অনন্ত। খেতে আমরা দুটি প্রাণী সুলতা। যা হোক করে আমাদের চলে যাবে। মলিনা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তবুও—

সুলতা। ঐ যা হোক করে কথাটাতেই আমার আপত্তি অনন্ত।

অসীম। একটা কথা তুমি বার বার ভুলে যাচ্ছ অনন্ত। সাতদিন সাতরাত সুলতা আমার ভাড়া করা ফ্ল্যাটে কাটিয়েছে।

অনন্ত। কিন্তু তার আগের তিন বছর? তখন আমি আর সুলতা ছিলাম, তুমি ছিলে না। তিন বছরের কাছে সাতদিন সাতরাত কতটুকু সময় অসীম?

অসীম। দামটা আমি ডবল করে দিচ্ছি অনন্ত।

অনন্ত। আমি তো বলেছি। তুমি তোমার লোকজনদের নিয়ে চলে যেতে পারো। আমি তোমাদের চিনি না।

অসীম। বেশ তাই হোক। তবে বাজারটা একবার যাচাই করে দেখলে পারতে অনন্ত।

দণ্ডধর। আপনি তো আচ্ছা গাধা অনন্তবাবু!

প্রথম। দেশে তোমার বুড়ো বাপ-মা আছে অনন্ত।

দ্বিতীয়। তোমার বোনের নাম মলিনা।

তৃতীয়। সুলতাকে তুমি ভালোবাস অনন্ত।

চতুর্থ । ওদেশে যাবার ইচ্ছে—সেটাও খুব একটা ছোট কথা নয়।

অনন্ত । না না না, তবুও নয়! কিছুতেই নয়! আমি তোমাদের স্বীকার করি না—আমি তোমাদের চিনি না!

দণ্ডধর। আজ থেকে আপনার চাকরি নেই অনন্তবাবু।

প্রথম । দেখ অনন্ত—আজ থেকে তুমি বেকার।

দ্বিতীয়। তোমার রুজি-রোজগার চলে গেল অনন্ত।

তৃতীয়। ভেবে দেখ অনন্ত—তোমার ভিত শুদ্ধু নড়ে গেল।

চতুর্থ । অনন্ত তুমি বেকার···অনন্ত তোমার রুজি-রোজগার নেই···অনন্ত তোমার ভিত শুদ্ধু নড়ে গেছে।

অসীম। তাই তো বলছি অনন্ত, তোমার মতামতটা বেচে দাও। আমরা চলে যাই—সব যেমন ছিল তেমন হোক।

অনন্ত। (প্রস্থান পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) আমি তা হলে যাচ্ছি স্থলতা। তুমি যদি চাও আমার সঙ্গে আসতে পারো।

স্থলতা। কথাটা তো কবার বললে অনন্ত।

অনন্ত । বেশ, তবে তাই হোক।

অসীম। অনন্ত—

অনন্ত । বলেছি তো অসীম, তোমার আমার মধ্যে পরিচয় নেই।

অসীম। কেন বলো তো?

অনন্ত । জঙ্গলের জানোয়ার আর স্বাধীন মানুষ—পরস্পরের মধ্যে কি পরিচয় আছে অসীম।

অসীম। স্বাধীন মানুষটি কি তুমি নাকি?

অনন্ত । নিশ্চয়। আমি, আমার আশ-পাশের লোক, আমাদের আদর্শ, সব মিলিয়ে নিশ্চয় আমরা স্বাধীন। (প্রস্থান)

অসীম। তবু শুনে রাখো অনন্ত। স্থলতাকে দরকার হলে আমার ফ্ল্যাটে পাবে। মলিনাকেও দরকার হলে আমার আপিসের খাসকামরায় পাবে। আর আমাকে দরকার হলে বড় রাস্তার ব্যবসায় পাবে। (ততক্ষণে অনন্ত চলিয়া গিয়াছে)

অন্ধকার

কণ্ঠস্বর। সমস্ত পঞ্চকের সেই ভীষণ গদাযুদ্ধ। দুই মহাবীর গদা হাতে নিয়ে দুটি বন্য বৃষের মতো ভীষণ গর্জন করতে করতে আক্রমণ করলেন

পরস্পরকে। গদার ঘূর্ণনে অন্তরীক্ষ ও ভূগর্ভ, মর্ত্যভূমি ও মহাসলিল প্রকম্পিত হলো। দেব, দৈত্য, দানব, নর, রাক্ষস ও নাগ, ত্রিভুবনের যাবতীয় অধিবাসী সমস্তপঞ্চকে নিজেদের দর্শকরূপে উপস্থিত করলেন।

আলো আসার আগে নানা কণ্ঠের স্বর

: কি দর যাচ্ছে?

: কোন্‌টার দর বলব বলো। এক এক জিনিস এক এক রকম।

: পর পর বলে যাও শুনি।

: বক্তৃতায় পঁচিশ, লিখে পঞ্চাশ, বই করে একশো, আর দল করে বেঁধে-ছেঁদে অন্য দেশে পাঠালে হাজার।

: দর কমাও দর কমাও, তোমাদের প্রতিপক্ষরা এমনি দিচ্ছে।

: এমনি দিচ্ছে? হঠাৎ?

: হঠাৎ তো নয়। তারা বরাবর এমনিই দিয়ে আসছে।

: কিন্তু কেন?

: তারা বলে ও-জিনিস বেচবার নয়, দেবার। ওটা নাকি সাধারণের সামগ্রী। তাই তো বলছি—দর কমাও, দর কমাও।

আলো আসে। বড় রাস্তার ব্যবসা

অসীম। এক নম্বরে কত গেছে?

প্রথম । চারশো পঁচিশ।

অসীম। দু নম্বরে?

দ্বিতীয়। চারশো পঞ্চাশ।

অসীম। তিন নম্বরে?

তৃতীয়। চারশো পঁচাত্তর।

অসীম। চার নম্বরে?

চতুর্থ । চারশো।

অসীম। কম কেন?

চতুর্থ । কখনো কম কখনো বেশি। ব্যবসার তো এইটেই নিয়ম।

: অনন্ত দেখা করতে চাইছেন।

অসীম। ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

মলিনার প্রবেশ

মলিনা। তুমি কি এখন খাসকামরায় আসবে অসীম? আমি কি তৈরি হয়ে থাকব?

অসীম। একটু বাদে যাব। অনন্ত এসেছে।

অনন্তর প্রবেশ

মলিনা। অনন্ত! (অনন্ত কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা অসীমের কাছে এগিয়ে আসে)

অসীম। তারপর অনন্ত, কি মনে করে?

অনন্ত। মলিনাকে নিয়ে যেতে এলাম।

মলিনা। কিন্তু আমি তো যাব না অনন্ত। আমি এখানে বেশ আছি।

অনন্ত। মলিনা এখানে কি করে অসীম?

অসীম। কেন? আমার খাসকামরার খাস চাকুরে।

অনন্ত। তার মানে দিনে মলিনা আর রাতে সুলতা?

অসীম। তোমার যেমন ইচ্ছে মানে করে নিতে পারো।

অনন্ত। তোমার জামাকাপড় গুছিয়ে নাও মলিনা।

মলিনা। তোমায় তো বললাম অনন্ত—আমি যাব না।

অনন্ত। মলিনাকে কি তুমি বিয়ে করবে অসীম?

অসীম। কিছু তো ঠিক করি নি। কদিন যাক। তারপর হয় মলিনা, না হয় সুলতা। কিংবা…হয়তো দুজনের কেউই নয়।

মলিনা। শুনলাম, তোমার নাকি চাকরি গেছে অনন্ত।

অনন্ত। তাতে কি এসে গেল। তোমার চাকরি তো রয়েছে।

মলিনা। সত্যি অনন্ত। অনেকদিন বাদে ভালো কাজ পেয়েছি। খাসকামরার খাসচাকুরে। ভালো খাওয়া, ভালো থাকা…জানলে অনন্ত…দেশে কিছু কিছু করে টাকা পাঠাচ্ছি।

অনন্ত। জানি। তোমার টাকার ওপর অসীমের টাকা। দেশে এখন বেশ ভালো টাকাই যাচ্ছে।

মলিনা। আমার মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ অনন্ত।

অনন্ত। জিনিস বিক্রি করলে দালালে কমিশন কাটে। দেখছি কমিশনের ছাপ মুখের ওপর পড়েছে কিনা।

মলিনা। আমি তো কিছু বিক্রি করি নি অনন্ত। আমি যুবতী। যৌবনের ধর্ম পালন করছি।

অনন্ত। নিজেকে তুমি মিথ্যে বোঝাচ্ছ মলিনা। তোমার যৌবন তুমি বিক্রি করছ।

মলিনা। এতদিন তো দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে এলাম অনন্ত। কিছু লাভ হলো কি।

অনন্ত। তাই বলে এই বেচা-কেনার হাটে নামবে?

মলিনা। সেটাই তো স্বাভাবিক। বেচা-কেনার কাল। ভালো দাম পাচ্ছি, বেচছি। আমি খুব সুখে আছি অনন্ত। তুমি যাও।

প্রথম। আমরাও তো সেই কথাই বার বার করে বলছি।

দ্বিতীয়। বলছি তো—তোমার মতামতটাও তুমি বেচে দাও।

তৃতীয়। বেচে দাও—দেখবে সুখের আর অবধি নেই।

চতুর্থ। বেচে দাও—দেখবে সুলতা, মলিনা সব তোমার কাছে ফিরে এসেছে।

অনন্ত। দেশে মার সঙ্গে দেখা করেছিলাম অসীম। দেখলাম, সেখানেও তোমার ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত।

অসীম। কেন—মা কিছু বললেন?

অনন্ত। বললেন—অসীম আমার কেউ নয়—তবু যেন পেটের ছেলের চেয়েও বেশি।

অসীম। তোমার জামাকাপড়গুলো বদলে ফেল অনন্ত। বিশ্রী ভাবে ছিঁড়ে গেছে। (কলিং বেল টিপিতেই একজন লোক জামাকাপড় লইয়া আসে)

অনন্ত। (জামাকাপড় লইয়া অন্তরালে চলিয়া যায়। অন্তরাল হইতে) কি ভাবছ বলব অসীম?

অসীম। কি বলো তো?

অনন্ত। জামাকাপড় বদলে আমাকে সমান করে নিলে—তাই না?

অসীম। যদি বলি, তাই? খুব ভুল হবে কি?

অনন্ত। কিন্তু সমান করে নেওয়ার জন্য এত আগ্রহ কেন?

অসীম। সমান সমান না হলে লড়ায়ে মজা হয় না।

অনন্ত। (বাহিরে আসিয়া) সত্যিকারের সমান করে নিয়ে লড়াই করতে পারবে অসীম?

অসীম। হুকুম করেই দেখ।

অনন্ত। তামিলটা কে করছে।

অসীম। কেন আমি—তোমার বান্দা।

অনন্ত। ঠাট্টা করছ?

অসীম। হুকুমটা করেই দেখ।

অনন্ত। তাহলে সত্যিকারের সমান হয়ে নিই। তারপর নতুন পর্যায়ে লড়াই। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।

অসীম। যা তোমার অভিরুচি।

অনন্ত। তাহলে হুকুমই একটা করছি—

অসীম। বললাম তো এক্ষুণি তামিল হবে।

অনন্ত। তোমার ব্যবসাটা এখন থেকে আমার।

অসীম। বেশ তাই হলো।

অনন্ত। (চারজনকে দেখাইয়া) এদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক অসীম?

অসীম। এদের আলাদা ব্যবসা। এদের ব্যবসার সঙ্গে আমার ব্যবসা মিলে এই বড় ব্যবসা।

অনন্ত। আজ থেকে এদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রথম। মনে রেখ আমি কিং এণ্ড কিং—

দ্বিতীয়। আমি শমুলকা এণ্ড গোমুলকা—

তৃতীয়। আর আমি হরচন্দ্র এণ্ড সন্স—

চতুর্থ। আর আমি কে জানো তো? ব্রাদার্স লিমিটেড।

অসীম। তবু তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

অনন্ত। তোমার ব্যবসায় কর্মচারী কত অসীম?

অসীম। ছশো।

অনন্ত। তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক?

অসীম। যা সর্বত্র হয়ে থাকে। গোলোযোগের।

অন্তরালে

কমরেডস—লড়াই আমাদের শুরু। আপনারা প্রত্যেকে ভেবে দেখুন কমরেডস—ভালোভাবে বাঁচার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। অথচ মাইনে যা পাই তাতে কোনোমতে বাঁচাও সম্ভব

নয়—ভালোভাবে বাঁচা তো দূরের কথা। কমরেডস—আপনারা আপনাদের বাড়ির কথা ভেবে দেখুন—ভেবে দেখুন আপনাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা। অশিক্ষা-অনাদর-আবর্জনা তাদের জীবনের নিত্য উপকরণ। সভ্যজগতে বাস করেও সভ্যতার শরিক হবার ক্রয় ক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারে নি। তাই কমরেডস—আমাদের মজুরি বাড়ানোর দাবি, আমাদের পুজো বোনাসের দাবি। দাবি আমাদের জয়যুক্ত হবেই—কমরেডস—হার আমরা মানতেই পারি না।…ইন কিলাব জিন্দাবাদ…ইন কিলাব জিন্দাবাদ…আমাদের দাবি মানতে হবে…আমাদের দাবি মানতে হবে…

অনন্ত। তোমার সঙ্গে ওদের আয়ের তফাৎ কত অসীম?

অসীম। অনেক।

অনন্ত। আজ থেকে তফাৎটা বাদ দিয়ে দাও।

অসীম। তাই দিলাম অনন্ত। (কলিং বেল টিপিলে একজনের প্রবেশ) আজ থেকে এই ব্যবসার সমস্ত আয় সবায়ের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হয়ে যাবে। (লোকটির প্রস্থান)

অন্তরালে

আমরা পেয়েছি কমরেডস। কিন্তু তবু এ পাওয়ায় বিশ্বাস নেই। ধর্মঘটের নোটিশ আমরা তুলে নিচ্ছি—কিন্তু দাবি হিসেবে এই পাওনাকে আদায় করে নেওয়ার কর্তব্য আমাদের রইল কমরেডস… ইন কিলাব জিন্দাবাদ…ইন কিলাব…

প্রথম ও দ্বিতীয়। (একসঙ্গে) এ রকম চুক্তি তুমি করতে পারো না অসীম—

অসীম। আমি তো করি নি—মালিক করেছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ। তোমার অনেক জোচ্চুরির হিসেব এখন আমাদের হাতে।

অসীম। সে হিসেবের বোঝাপড়া এখন মালিকের হাতে।

চারজন। (একসঙ্গে) আমরা বিশ্বাস-ভঙ্গের মামলা দায়ের করব।

অসীম। করতে পারো তোমাদের যা ইচ্ছে। মালিকের হুকুম তামিল করা ছাড়া এখন আর আমার কোনো কাজ নেই।

অনন্ত। স্বলতাকে ডাকো অসীম।

অসীম। স্বলতা—

স্থলতা । ডাকছিলে অসীম ?
অসীম । আমি তো ডাকি নি—মালিক ডেকেছেন।
স্থলতা । কে মালিক ? অনন্ত ?
অসীম । হ্যাঁ স্থলতা।
অনন্ত । এখন আমাকে বিয়ে করবে স্থলতা ?
স্থলতা । নিশ্চয় করব। বিয়েতে তো আমার আপত্তি নেই অনন্ত। বর আমার মালিক হলেই হলো।
অনন্ত । এখন আমার সঙ্গে ফিরে যাবে মলিনা ?
মলিনা । না অনন্ত—সেটা আর হয় না। নিজেকে বিক্রি করেছি—কিন্তু কোথায় যেন অসীমকেই ভালোবেসেছি।
অনন্ত । দুটো বিয়ের যোগাড় করো অসীম।
অসীম । কার কার অনন্ত ?
অনন্ত । একটা তোমার আর মলিনার, আর একটা আমার আর স্থলতার।
অসীম । বেশ তো—সামনেই আদালত—চলো যাওয়া যাক।

সামনেই আদালত

বিচারক । আজ কটা মামলা।
মুনশী । তিনটে হুজুর।
বিচারক । কি কি ?
মুনশী । দুটো বিয়ের, একটা বিশ্বাসভঙ্গের।
বিচারক । বিশ্বাসভঙ্গটাই আগে হোক। শেষে বিয়ে দেওয়া যাবে।
মুনশী । বিশ্বাসভঙ্গের মামলা হাজির ?
চারজন । (একসঙ্গে) হাজির হুজুর।
বিচারক । কিসের নালিশ তোমাদের ?
চারজন । (একসঙ্গে) বিশ্বাসভঙ্গের হুজুর—
বিচারক । নালিশ কার নামে ?
চারজন । (একসঙ্গে) প্রথমে ভেবেছিলাম অসীমের নামে, কিন্তু এখন দেখছি অনন্তর নামে।
বিচারক । নালিশের আবার আগে-পরে আছে নাকি ?
চারজন । (একসঙ্গে) প্রথমে মালিক ছিল অসীম হুজুর, কিন্তু এখন অনন্ত।
বিচারক । চুক্তিটা ভেঙেছে কে ?

চারজন । (একসঙ্গে) অনন্ত।
বিচারক । কি করেছ তুমি ?
অনন্ত । তেমন কিছু তো করি নি।
বিচারক । (অসীমকে) তুমি জানো ও কি করেছে ?
অসীম । ব্যবসার সমস্ত আয় সকলের মধ্যে সমান করে ভাগ করে দিয়েছে।
বিচারক । এতে কোন্ চুক্তিটা ভঙ্গ হচ্ছে ?
চারজন । (একসঙ্গে) আজ্ঞে লোয়ার কস্ট্ স্ এণ্ড হায়ার প্রফিটের চুক্তিটা।
বিচারক । সর্বনাশ ! এ চুক্তি তো জাতির মেরুদণ্ড ! আসামী অনন্তরাম—তোমার আজীবন কারাদণ্ড। (কলম ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মুনশীর ইঙ্গিতে দুইপাশ হইতে দুইজন পুলিস অনন্তকে লইয়া গেল)
মুনশী । আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে। ইওর অনার ফিরে এসেই বিয়েটা দিয়ে দেবেন।
অসীম । বিয়ে ? বিয়ে তো আর হবে না।
মুনশী । বা রে ! আমার মিষ্টিটা—
অসীম । এই টাকায় কিনে খেও। (চারজনকে) কি রকম হল ?
চারজন । (একসঙ্গে) এমনটি কখনও হয় নি।
অসীম । ব্যবসার কি খবর ?
চারজন । (একসঙ্গে) রেল কি চাক্কা নেহি চলে গা—
অসীম । মানে ?
চারজন । (একসঙ্গে) মানে আবার কি—ধর্মঘট।
অসীম । চলো তাহলে ফেরা যাক।
চারজন । (একসঙ্গে) চলো—
স্থলতা । আমি কি তোমার সঙ্গেই যাব অসীম ?
অসীম । নিশ্চয় !
স্থলতা । কিন্তু আমার দিনের আলোর অনন্ত অসীম—
অসীম । তার কথা তো শুনলে স্থলতা—
স্থলতা । কিন্তু আমার অনন্তর কথা আবার মনে পড়ছে অসীম। তোমার সঙ্গে যাওয়া তো আমার হলো না। (প্রস্থান)
অসীম । স্থলতা—
মলিনা । আর আমি অসীম ?

অসীম । তোমাকে তো নিতে পারব না মলিনা ।

মলিনা । কেন অসীম ?

অসীম । ঐ যে তুমি বললে—বিক্রিও করেছ—ভালোওবেসেছ ।

মলিনা । তাহলে আমার দামটা মিটিয়ে দাও অসীম ।

অসীম । নিশ্চয় । কটা দাম পাওনা আছে তোমার ?

মলিনা । খাসচাকুরে থাকাকালীন চারটের ।

অসীম । এই নাও ।

বড় রাস্তার ব্যবসা

অসীম । কই, এবার বোতল বার করো ।

প্রথম ও দ্বিতীয় । তা না হয় করছি—কিন্তু ওদিকে—

অসীম । ওদিকে ? ওদিকে আবার কি ?

তৃতীয় ও চতুর্থ । ঐ যে বললাম—রেলকা চাক্কা নেহি চলেগী—

অসীম । মানে ?

চারজন । (একসঙ্গে) মানে—ধর্মঘট—

অসীম । ধর্মঘট ! যত সব ক্লীবের দল ! (টেবিলে আঘাত করিয়া বোতল ভাঙ্গে । পান করিয়া) লড়ায়ে আমার জিত ।

এমন সময় মেঘ গর্জনের ন্যায়

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

: অনন্ত রামের—

: মুক্তি চাই—

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

অসীম । কি চাই তোমাদের ?

মলিনা । অনন্তরামের মুক্তি ।

অসীম । কিন্তু মলিনা, তুমি ?

মলিনা । শুধু আমি নই অসীম, স্বলতাও আছে ।

অসীম । স্বলতা তুমি ?

স্বলতা । শুধু আমি নই অসীম—আমার সঙ্গে এরাও আছে ।

: মলিনা বিক্রি করেও ভালোবাসতে পারে । তাইতো মলিনা আমাদের সঙ্গে । চীনে লণ্ঠনের আলোয় তোমার শয্যা স্বলতার আশ্রয়—তাই সূর্যালোকের পথে সে আমাদের পতাকাবাহী ।

অসীম । কিন্তু অনন্তরামের মুক্তি ? সে মুক্তির মালিক তো আমি নই ।

: তবু সে মুক্তি তোমাকেই এনে দিতে হবে । ও বিচারক তোমার—ও বিচারকক্ষ তোমার । ও বিচার তোমারই করা—ও রায় দেওয়াও তোমার । তাই প্রাণ দিয়েও ও মুক্তি তোমাকেই এনে দিতে হবে ।

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

: অনন্তরামের—

: মুক্তি চাই—

: ইন কিলাব—

: জিন্দাবাদ—

(অসংখ্য লোকের মিছিল চারজনের সঙ্গে অসীমকে নিঃশেষে অবলুপ্ত করিয়া দেয় । তারপর ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে মিছিলের প্রস্থান । সঙ্গের চার জনের কোনো চিহ্ন নাই । মঞ্চে অসীম একা । যুদ্ধ-ক্লান্ত পরাভূত অসীম)

আলো কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে

কণ্ঠস্বর । আর সেই বিশাল প্রান্তরে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী যুদ্ধান্তে ভগ্নোরু হয়ে পড়ে রইলেন দুর্যোধন । কোথায় আজ তাঁর মিত্রেরা ? কোথায় আজ তাঁর স্বজনবর্গ ? কোথায় তাঁর রাজ্য ও ধনসম্পদ ? কঠিন প্রান্তরভূমি আজ তাঁর শয্যা, অনন্ত প্রসারিত অন্ধকার আকাশ আজ তাঁর চন্দ্রাতপ, হিংস্র শ্বাপদের দল তাঁর পরিচারক ।

যবনিকা

শতবার্ষিকী বৎসরে আবেদন

যিনি সর্বদেশের মানুষের মহান বন্ধু, স্বাধীনতা ও বিশ্বমৈত্রীর অগ্রপথিক—সেই মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের স্বদেশবাসী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষিকী উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার জন্য আমরা, ভারতবর্ষের লেখক শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা, আমাদের দেশের জনসাধারণের সঙ্গে রবীন্দ্রশতবার্ষিকা শান্তিউৎসবে রবীন্দ্রমেলায় সমবেত হয়েছি। যে মানুষ নিজের জোরে ও বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করেছেন, হৃদয় দিয়ে সৃষ্টির মাধ্যমে যে মানুষ মর্মজগৎ-কে মুগ্ধ করেছেন, সকল মহাদেশপরিব্যাপ্ত সেই মানুষের কণ্ঠস্বর তাঁর রচনায় প্রতিধ্বনিত। মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান নি কোনোদিন। তাঁর সেই বিশ্বাসে উদ্দীপিত আমরা এখানে সমবেত হয়ে সমস্ত মানুষের উদ্দেশেই জানাই আমাদের অভিনন্দন। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত দেশের জনগণ, আমরা আপনাদেরই অংশ, আপনারা আমাদের। আপনারাই আমাদের প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনার মহান উৎস।

আজ থেকে একশ বছর পূর্বে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই শহরে সমবেত হয়ে আমরা আপনাদের—সমস্ত দেশের লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণকে অভিবাদন করি! সৃষ্টি ও মানবপ্রকৃতির পথে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসাবে আপনাদের জানাই অভিনন্দন। শিল্প ও বিজ্ঞানের সহকর্মিগণ, আসুন আমরা শান্তি ও স্বাধীনতার ব্রতে নতুন করে আমাদের নিয়োজিত করি। কবির কাছ থেকে এই শিক্ষাই আমরা লাভ করি—শান্তি এবং স্বাধীনতার আবহাওয়াতেই শিল্প পায় কৈবল্য আর মানুষের ঐতিহ্য হয় নিরাপদ। আমরা ঘোষণা করি মানব উত্তরাধিকারের এই সংগ্রাম, মানবিক আদর্শপূর্তির এই যুদ্ধ, এই যুদ্ধই আমাদের যুদ্ধ, আমাদের একমাত্র যুদ্ধ, এই যুদ্ধই বরণীয় যুদ্ধ।

আফ্রিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং জনগণের উদ্দেশ্যে

'ছায়াবৃতা' মহাদেশের বন্ধু, আমরা, এই নগরী থেকে আমাদের মৈত্রীপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আফ্রিকার বন্ধুগণ, আধুনিক যুগের আলোর পথযাত্রী আপনাদের অভ্যুত্থানে আমরা উল্লসিত। ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে মুক্তিসংগ্রামে আপনারা অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি, নতুন পৃথিবী রচনায় আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাব, অপেক্ষা করে আছি আপনাদের জন্যে, সভ্যজগতে যে আনন্দ, উন্মাদনা এবং যৌবনোচ্ছল সজীবতা আপনারা এনে দেবেন, তার জন্যে। আপনাদের স্বচ্ছন্দ মহৎ অবদান ছাড়া এই সভ্যতা খণ্ডিত।

এশিয়ার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আপনাদের অভিনন্দিত করি এশিয়ার মহান দূত রবীন্দ্রনাথের নামে। আপনাদের শিল্পের ঐতিহ্য সভ্যতার বিকাশকে পরিপুষ্ট করেছে। আপনাদের রয়েছে মর্মলোকবিজয়ী ইতিহাস। আসুন, মানুষ এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে আমরা আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনি, মানুষ এবং তার ভবিষ্যতে রাখি আনত আস্থা। আসুন, সেই ভবিষ্যৎ আমরা নির্মাণ করি যা অতীতের এশিয়ার মতো মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর।

লাতিন আমেরিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আপনাদের ভাগ্য নতুন করে রচনা করার লগ্ন সমাসন্ন। আপনাদের স্বাধীনতা ও জাগতিক নতুন পৃথিবী নতুন নিয়তির জন্মদান করবে, নতুনতর মানবেতিহাসের সম্ভাবনাকে করবে সুনিশ্চিত। সেই সঙ্গে আপনাদের এই ইতিহাসরচনার আনন্দ, গৌরব ও মহান দায়িত্বভার আমরাও গ্রহণ করছি।

ইওরোপ এবং উত্তর আমেরিকার লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণ, আধুনিক ইতিহাস এবং মুক্তি ও সাম্য, মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার বার্তাবহ আধুনিক মানবতাবাদের জয়পতাকা উত্তোলনের গৌরব আপনাদের রয়েছে। এই শক্তি নিয়ে আপনারা পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলির সঙ্গে আরও এগিয়ে চলুন, এই আবেদন করি। আমাদের মহান রবীন্দ্রনাথের প্রিয় স্বপ্ন তাহলেই সার্থক হবে।

সর্বোপরি পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবী, কর্মী এবং জনগণ, আপনাদের প্রতি আবার আমাদের আবেদন এই, যে-ধ্রুব মন্ত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু শরণ্য, সেই মন্ত্রই হোক আমাদের পথের দিশারী। আসুন, মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের গুরুদেবের এই মানসিকতায় প্রণোদিত হয়ে আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিবাহী বর্তমানের জন্য, শিল্পীর ব্রত পালনের জন্য এবং যুদ্ধহীন মুক্ত শান্তির পৃথিবীর জন্য আত্মনিয়োগ করি।

শান্তি, শান্তি, চিরশান্তি।

পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব ও মেলার সমাপ্তি অধিবেশনে (১২ই নভেম্বর ১৯৬১) সারা বিশ্বের লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও জনগণের প্রতি এই আবেদনটি গৃহীত হয়। মূল ইংরিজি থেকে অনুবাদ করেছেন শিবশম্ভু পাল। —সম্পাদক

পুস্তক পরিচয়

দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ ॥ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। সাড়ে ছয় টাকা ॥

পত্রলেখার বাবা ॥ সতীনাথ ভাদুড়ী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চার টাকা ॥

সান্নিধ্য ॥ চিন্তামণি কর। ত্রিবেণী প্রকাশন। চার টাকা ॥

আলোচ্য তিনটি বইয়ের মধ্যে প্রথমটি উপন্যাস, দ্বিতীয়টি ছোটগল্পের সমষ্টি ও তৃতীয়টি স্মৃতিকথা। কিন্তু স্মৃতিকথা হলেও শেষের বইটিকে প্রায় কথাসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কেননা এই বইটির বিশিষ্ট রস প্রায় পুরোপুরি কথাসাহিত্যের।

এই তিনটি বইয়ের মধ্যে আরও একটি সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি বইকেই বলা যেতে পারে পোর্ট্রেট-গ্যালারি। নানা জাতীয় লোকের ভিড়ে এই তিনটি বই ঠাসা—অন্তত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বইটি।

বিশ্ববাবুর বইটিতে মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। কিন্তু তারা প্রায় সকলে একই ছাঁচে ঢালা। প্রথমত এরা সকলেই যুবক-যুবতী; দ্বিতীয়ত দেশোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করে নানা দুঃসাহসিক কাজে শুধু লিপ্ত নয় ক্ষিপ্তপ্রায়। তৃতীয়ত, বিচিত্র বিপদের সম্মুখীন হলেও কোনো-এক অদৃশ্য জাদুকরের আশীর্বাদে বিপদের স্পর্শ এরা সর্বদা এড়িয়ে চলে। এর পর বোধহয় এ কথা বলা বাহুল্য যে, যেহেতু এরা যুবক-যুবতী অতএব এদের পরস্পরের প্রতি যৌন আকর্ষণ কিঞ্চিৎ প্রবল। কিন্তু তবু এদের মিলন হয় না অর্থাৎ উপন্যাসটির পরিসরের মধ্যে। এই পরিসর নিতান্ত সামান্য নয়। স্মলপাইকায় ছাপা ডিমাই সাইজের চারশো তিন পাতা। আরো মাত্র দু-চার পাতা বাড়লে যে মিলন হত লেখক সে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেননা যদিও সশস্ত্র পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ থেকে এরা অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পায় তবু শেষপর্যন্ত এইসব ঝামেলা বরদাস্ত করবার মতো শক্তি বা প্রবৃত্তি এদের কারও নেই। অতএব শেষপর্যন্ত এইসব দুঃসাহসিক

যুবক-যুবতীর নেতার বিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে স্বদেশ উদ্ধারের প্রশস্ততম উপায় জাহাজে চড়ে বিদেশে পলায়ন। এবং জলপথে নায়কনায়িকার মিলন। এর ব্যতিক্রম দু-একটি আছে, তা অতীব শাস্ত্রীয় এবং সে শাস্ত্র হল কামশাস্ত্র।

বইটির নামকরণে লেখক বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন—আর কোথাও নয়।

'পত্রলেখার বাবা' ও আরও আটটি গল্প নিয়ে দ্বিতীয় বইটি রচিত। এই নয়টি গল্পে এমন-সব নরনারীর সাক্ষাৎ মেলে যারা এই পৃথিবীরই লোক বলে মনে হলেও মাঝে মাঝে যেন একটু সন্দেহ হয় কেননা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে এদের খাপখাওয়ানো একটু শক্ত। বাস্তব জগতের বাইরে না হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে এদের জীবনযাত্রা। সতীনাথবাবু জাগরীর জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এরপর মনে হয় যেন আরও কিছুদূর এগোলে তাঁকে ভিড়তে হবে সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন যাঁরা—তাঁদেরই দলে। কেননা বাংলা কথাসাহিত্যের পুরোনো ধারা নিঃসন্দেহে শুকিয়ে এসেছে—আর তাই তাগিদ এসেছে নতুন পথের সন্ধানের, যার ফলে হচ্ছে কিছু সৃষ্টি আর কিছু অপসৃষ্টি। এই তাগিদে প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত লোকেরা যদি তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা করেন তাতে ক্ষতি কী?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন অন্তত একটি উপন্যাস প্রায় প্রত্যেক লোকেই লিখতে পারে। 'সান্নিধ্য' উপন্যাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু একটু এদিক ওদিক করে এরই মালমশলা নিয়ে একটি রীতিমত উপন্যাস লেখা যেতে পারত মনে হয়। বহুদিন আগে এই 'পরিচয়' পত্রিকাতেই রাখালচন্দ্র সেন 'সহযাত্রী' বলে একটি গল্প লিখে আমাদের চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন—এরকম গল্প আর কখনো পড়ি নি—বাংলাসাহিত্যের সত্যিকারের নতুন সৃষ্টি। অনেকেরই মনে হয়েছিল এটি গল্প নয় সত্যিকারের কাহিনী।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি করের 'সান্নিধ্য' পড়ে বার বার মনে পড়েছে সেই 'সহযাত্রী' গল্পটির কথা।

লেখক প্রখ্যাত শিল্পী এবং শিল্পশিক্ষার জন্যে আড্ডা গেড়েছিলেন প্যারিস শহরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে। সে-সময়ে তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছিল নানাদিগ্‌দেশাৎ আগত বিচিত্র সব নরনারী। তাদের মধ্যে কেউ-বা

এসেছিল স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের থেকে পালিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে, কেউ-বা পূর্ব-ইওরোপ থেকে প্যারিসে বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যালয়ের আকর্ষণে।

এদের মধ্যে অনেকেই ছিল তরুণ-তরুণী। সুতরাং মন দেওয়া-নেওয়ার অবকাশ ছিল প্রচুর। এই টানাপোড়েনের মাঝখানে থেকে লেখক এদের নাড়ীর স্পন্দন যা অনুভব করেছিলেন বইটিতে দিয়েছেন তারই বিবরণ। এই বিবরণ শুধু মর্মস্পর্শী নয়, অনেক জায়গায় হয়েছে মর্মান্তিক। কেননা পরিবেশ ছিল শুধু রোমান্স নয় ট্র্যাজেডির উপযোগী।

এইরকম কাহিনীতে পলিটিক্স এসে পড়া অনিবার্য। এবং তা এসে পড়লে কোনো খাঁটি লেখক নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে। এমন কথা কিছু আছে এই বইটিতে যা 'পরিচয়'-এর অনেক পাঠক-পাঠিকার আছে অপ্রীতিকর বা অস্বস্তিকর লাগতে পারে।

চিন্তামণিবাবু যে খাঁটি কথাশিল্পী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-রকম বই কি তিনি আর একটিও লিখতে পারবেন?

হিরণকুমার সান্যাল

রানীপালঙ্ক ॥ বিজন ভট্টাচার্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। আড়াই টাকা ॥

রাজনৈতিক ভূগোলের বিচারে অবশেষে বাঙলাদেশ দুটি ভাগে বিভক্ত হল, এবং ঢাকা-নবাবনগরের দক্ষদারুশিল্পী যোগীবরকে এসে উঠতে হল কলকাতার কোনো এক উদ্বাস্তু কলোনীতে। সঙ্গে রইল গ্রামসম্পর্কের লোকজন, নিজের সংসার ও অখণ্ড বাঙলার গাঙ-দরিয়ার খোলা মেজাজ।…কিন্তু নিজেকে যোগীবর মেলাতে পারে না এই নতুন কলোনী জীবনের অহেতুক, আরোপিত দারিদ্র্যে। আর তাই পদ্মার নাম তার মুখে আসে না, বলে—কালীদহ। বলে, "কালীদহ-ই তো, পদ্মা তো কমু না মুখে। হেই কালীদহেই না ডুবাইয়া আইলাম বেবাক স্বপ্ন সাধ।"…তথাপি রাত্রের কলোনীর উপর ভাড়াটে গুণ্ডার পাশবিক আক্রমণে, এবং দিনমানে শহর কলকাতার স্বর্ণমারীচের ডাকে ক্রমে ছত্রভঙ্গ-হয়ে-যাওয়া উপনিবেশের মানুষ-গুলোকে সে আবার জড়ো করে, জমিয়ে তোলার চেষ্টা করে। আশার কথা শোনায়। কিন্তু শান্ত জীবনের কথা শোনবার কান তখন আর নেই তাদের। ক্ষতবিক্ষত হয়ে হয়ে ততদিনে তারা 'গেরিলা' হবে স্থির

করেছে, অর্থাৎ গেরিলাযুদ্ধে একবার নেবে দেখবে বাঁচার এই লড়াই জেতা যায় কি না। আর অবশিষ্ট একটা অংশ আপোসে উচুমহলের চাবুকের তলায় আত্মসমর্পণ করেছে।—এই দুইদিকের দোলাচলে অভিজাত কাঠের কারিগর বৃদ্ধ যোগীবর সূত্রধর চিন্তিত হয়ে পড়ে। এবং আকস্মিকভাবে, একদিন, প্রায় সরাসরি ঐ অসুস্থ অক্ষম শরীরেই বেরিয়ে পড়ে কাজের খোঁজে। আপোসে সে রাজি নয়। কাজ সে পায়, এক কাঠের কারখানায়। কিন্তু তার ভিতরকার শিল্পীর সূক্ষ্মতা এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে নির্মমভাবে আহত হয়। যোগীবর তবু সংসারে সুস্থতা আনবার চেষ্টায় অমানুষিক পরিশ্রম করে যায়। অতঃপর অসুখে পড়ে সে। এবং মৃত্যুর পূর্বে স্বপ্নের মতো ভেসে আসে তার নিজের প্রথমজীবনের অপরূপ সৃষ্টি 'রানীপালঙ্ক'-র স্মৃতি, আচ্ছন্ন দৃষ্টির উপর দিয়ে বয়ে যায় সেই একতারা গ্রামের নদী—যার ঢেউয়ে নৌকায় "গোটা একটা ঝাড়লণ্ঠনের" মতো আলোয়-আলো ঐ রানীপালঙ্ক সে উপহার পাঠিয়েছিল "বড় রায় জগৎকিশোরের মেয়ের বিবাহবাসরে।" লেখকের বর্ণনায়—"উত্তাল তরঙ্গমালার ওপর দিয়ে টলকাতে টলকাতে, নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে সেই স্বর্ণ অতীত।" যোগীবরের স্ত্রী সৌরভা এই চোখের ভাষা আন্দাজে বুঝতে পারে, "মেঘনা আর পদ্মার বুকে পাহাড়ের মতো কালো কালো গয়নার নৌকোগুলো যখন আকাশ-গঙ্গা থেকে মর্ত্যের নদীর বুকে নেমে আসে, তখন এমনি করেই দেখতে হয় সেই নৌকো।" রানীপালঙ্কের কারিগর মৃত্যুশয্যায় শেষবারের মতো "তৈরি হয়ে নিল" সমৃদ্ধ যৌবনকালের স্বপ্ন দেখতে দেখতে।···আরো বড়ো ঢেউয়ের থেকে বাঁচবার জন্য বোধকরি জীবনের দামে "তৈরি হয়ে নিল" .ঢাকা-নবাবনগরের কাঠের যাদুকর যোগীবর সূত্রধর।

প্রসঙ্গত জানানো দরকার, 'রানীপালঙ্ক'-র যাবতীয় সংলাপ লিখিত হয়েছে বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষায়; অর্থাৎ ওখানকার মাটি-নদীর সকল সৌরভ সহজেই গ্রন্থটিকে পূর্ববঙ্গের মাধুর্যে উদ্ভাসিত করতে পেরেছে (এবং সেদিক থেকে আমরা তাঁর 'নবান্ন'-র স্বাদ আবার পেলাম)। কিন্তু, যারা 'গেরিলা' হবে বলেছিল, তাদের কথা আর জানা গেল না কেন? অবশ্য পরিবর্তে, আমরা যোগীবরের ক্রমপরিণতি অনুধাবন করলাম, তবু দুঃখের দাহনে নিরুপায়ভাবে পুড়ে মরাটাই কি সত্য? তদুপরি, 'রানীপালঙ্ক' একটি আধা-যন্ত্রণা-বিলাস জাতীয় আচ্ছন্নতা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেছে,

যেটি অন্তত এই গ্রন্থে কাম্য ছিল কি? এবং নানা-স্থানে 'নাট্যকার' বিজন ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এই উপন্যাসের আঙ্গিক সাফল্য কিছু কিছু খণ্ডিত হয়েছে মনে হল (যদিও ৫০-৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত শাণিত গৃহবিবাদটির নাটকীয়তা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অবিকল। ঐ দৃশ্যটির মর্মান্তিক তীক্ষ্ণ বাস্তবতা এখনো যেন চোখে লেগে আছে)।

বক্তব্যের প্রয়োজনে উপন্যাসটির কোনো-কোনো স্থূলতা তবু অক্লেশে অগ্রাহ্য করা যায়। কেননা, 'রানীপালঙ্ক'-এ সময়োচিত mass literature-এর সবল লক্ষণগুলি আংশিকভাবে বর্তমান, মনে করি। এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে পারি, একতারা গ্রামের ঐ সুদূর করুণ "লাউগাছটিকে" আমরা চিনি।···

বিজনবাবুর এই উপন্যাস প্রচেষ্টায় ও বিষয়মহিমায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

অতলান্ত ॥ ব্রজেন মজুমদার। দেড় টাকা ॥

রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির ওপর অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনকে অবলম্বন করেও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের দীর্ঘ পটভূমিকা থেকে নাটকীয় একটি মুহূর্তকে বেছে নিয়ে স্বল্প পরিসরে নাট্যরূপায়ণ কদাচিত দেখা গেছে। কথোপকথনের ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-জীবন-কাহিনী বর্ণনার প্রয়াস যে একেবারে হয় নি, তা বলা যায় না। কিন্তু সেগুলি নাটক নয়।

'অতলান্ত' নাটকের স্বল্প পরিসরে পাঞ্জাবের তথা ভারতীয় উপনিবেশ ভূমিতে ইংরেজ সরকারের দুর্দমনীয় ও অনপনেয় কলঙ্ক-চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু এই কলঙ্ক-চিত্রের বীভৎসতার চেয়েও বাংলাদেশের রাজনৈতিক কলঙ্কের চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলাই বা বলি কেন, তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিকের মানস পটভূমি চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। নাটকের কেন্দ্রীয় নাট্যিক মুহূর্ত যদি কিছু থাকে, তাহলে 'অতলান্ত' নাটকের এটিই কেন্দ্রীয় ও চরম মুহূর্ত।

ইংরেজের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজীকে সঙ্গে করে বিনা অনুমতিতে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবেন বলে রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন, লেভিকে দিয়ে এই সংবাদ তিনি প্রেরণ করলেন। কিন্তু গান্ধীজী লেভির মারফৎ জানিয়েছেন যে তিনি এখন ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চান না।

গান্ধীজীর কাছে রবীন্দ্রনাথের সকল আশা চুরমার হয়ে গেল। এরপরে রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন বাংলাদেশের দেশহিতৈষী নেতাদের সাহায্যে পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এক সভা আহ্বান করবেন, এই উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে সংবাদ পাঠালেন। চিত্তরঞ্জনও এখন সভা ডাকতে নারাজ, মুখে আপত্তি জানালেন যে সভাপতি হবার মতো কেউ নেই। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ জানালেন সভাপতির জন্যই যদি সভা ডাকা না যায়, তাহলে তিনি নিজেই সভাপতি হবেন। "এ কিন্তু সব আপনার দায়িত্বে, আমাদের কিছু নেই এতে" এই বলে দেশবন্ধু বেরিয়ে গেলেন।

রাজনৈতিক লীলার ও মানসিক সংকটের দ্বন্দ্বে পড়েই রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা অত্যুচ্চ শীর্ষতায় আরোহণ করেছে। যৌবনে একদা গান রচনা করেছিলেন, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে", সেই বাণীকেই শিরোধার্য করে মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ অতন্দ্র রাত্রির ভয়ংকর জ্বালামুখিতা সহ্য করে, ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' উপাধি বর্জন করলেন। ইংরেজের ব্যবহারের ও নীতির তীব্র ভৎর্সনা করে বজ্রগম্ভীর স্বরে জানালেন মানব-সত্যের পটভূমিকায় এ অন্যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও মানব-প্রেমিক ও স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মহনীয়তা চমৎকার উদ্‌ভাসিত হয়েছে।

নাটকের এই কেন্দ্রীয় মুহূর্ত শেষের দিকে সংঘটিত হয়েছে। এর পূর্বে শান্তিনিকেতনের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের হাস্য পরিহাসিকতা, নাচে গানে নাটকের মাধ্যমে তাঁর আনন্দসত্তার প্রকাশ হয়েছে। এর ফলে পূর্বাংশ অত্যন্ত শ্লথ মন্থর। অন্য চরিত্রগুলিও যথাযথ ব্যক্ত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের বাগভঙ্গি ও রীতিকে যথাযথ ধরবার চেষ্টা করেছেন, তবে 'সাথে'র ব্যবহার বেমানান। আর অনেক চরিত্র এখনও জীবিত, তাঁদের সঙ্গে আমরা পরিচিত, নাটকে তাঁদের উপস্থাপনা নাট্যরসের অন্তরায় ঘটায় যখনই নাটকের ও বাস্তবের মানুষের তুলনা করি। এবং রবীন্দ্রনাথও এত কাছের মানুষ যে তাঁকে নিয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি কল্পনা করতে বাধে। ফলে নাট্য-রূপায়ণের দিক থেকে বাধা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশি। অর্থাৎ 'অতলান্ত'-র অতলান্ততা পাঠের আস্বাদনে, নাট্যশিল্পের যাথার্থ্যে নয়। তবু, সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে এই মহান পুরুষের মানবিক অনুভূতি সর্বমুক্ত মানব-হৃদয়ে অনন্ত সত্তার সংবেদনা সৃষ্টি করবে।

বার্ণিক রায়

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

প্রসঙ্গক্রমে

সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার নব-জাগরণের চরিত্র সম্বন্ধে 'পরিচয়'-এ যে পুনরায় আলোচনা শুরু হয়েছে—তা দেখে আনন্দিত হলাম। মনে পড়ছে ১৯৪৯-এ কতকটা এ-ধরনের বিষয় নিয়েই আলোচনা চলেছিল—নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা' এ-ব্যাপারে উজ্জ্বল স্মারক। আজ রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে আবার সেই আলোচনা উঠেছে—তাই সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে সাধারণভাবে কিছু ব্যক্তিগত মতামত জানাচ্ছি।

সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি, বাংলার নবজাগরণ সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে। কথাটির সত্যতায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। সত্যিই বাংলার নবজাগরণ হয়েছে বুর্জোয়া শিক্ষা দীক্ষায়। কিন্তু কথা হল—"আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতিতে যে বৈচিত্র্যহীনতা, একঘেয়েমি"—"অতি দীর্ঘায়িত সামন্ত যুগের মন্থরতার প্রতিলিপি", উনিশ শতকে তার যে আমূল রূপান্তর দেখা গেল, তা কি শুধুমাত্র শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থাৎ ভাবজগতে? বাংলার নবজাগরণকে আমরা বলে থাকি পুরোপুরি উপরিতলের ব্যাপার—'বাবুকাল্‌চার'। যে বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষায় নবজাগরণ হল একটি পরাধীন উপনিবেশে—তা "মাটি থেকে রসগ্রহণ নয়, আকাশের সূর্যালোকের দিকে দুবাহু মেলে দেওয়া?"—একথা মেনে নিয়েই শ্রীসুশোভন সরকার বা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন। কিন্তু একথা মানতে আমার আপত্তি আছে। মার্কসবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে "যেমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের অভিমত সেই ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে ধারণার ওপরে নির্ভর করে না, ঠিক তেমনি একটি রূপান্তরের যুগকে আমরা সেই যুগের নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করতে পারি না। পক্ষান্তরে, এই চেতনাকেই আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের স্ববিরোধের আলোকে, উৎপাদনের সামাজিক শক্তি সমূহ এবং উৎপাদনের সম্পর্ক সমূহের মধ্যে প্রচলিত সংঘাতের আলোকে।"

আমরা ঠিক এর উল্টো পথেই চলেছি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দ্বৈত রূপ ও তার চরিত্রের দিকে নজর না দিয়ে শুধুমাত্র ইডিয়লজির ক্ষেত্রে পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের দ্বন্দ্ব নিয়ে তর্কাতর্কি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা নয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মার্কসের ১৮৫৩ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মার্কস দেখেছিলেন ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে কলকাতায় ইংরেজের তত্ত্বাবধানে, অনিচ্ছায় ও কৃপণভাবে শিক্ষিত হয়ে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে, যারা ইওরোপীয় বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত, সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন। নিঃসন্দেহে এঁরাই হলেন বাংলার নবজাগরণের প্রতিভূবৃন্দ। এবং এই কথাটির কিছু পরেই মার্কস লিখেছেন, "সেদিন দূরে নয় যখন রেলপথ ও বাষ্পীয়পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই একদা রূপকথার দেশটা এইভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কস অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। করতেন লেনিনও। অল্পাধিক দূর ভবিষ্যতে এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির যে পুনরুজ্জীবন ঘটবে—এ বিশ্বাস তাঁদের দুজনেরই ছিল। কিন্তু এই "পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্তর্ভুক্তি"র অর্থ কী?

আমরা জানি, ইতিহাসে বুর্জোয়াসি কী বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েছে। তারা পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকেও সভ্যতার, অর্থাৎ বুর্জোয়া হবার, আওতায় টেনে আনে, এক কথায় নিজের ছায়া (ইমেজ)-রই তারা একটি জগৎ গড়ে তোলে। জাতির বিচ্ছিন্নতা ও আত্মনির্ভরতার জায়গায় আসে বিশ্বের সকল জাতির পরস্পর নির্ভরতা। ভারতে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা পুরাতন এশীয় সামন্তবাদের জায়গায় আনল নতুন পুঁজিবাদ—যার জন্মস্থান ইওরোপ। আর ভারতে ইতিহাসের অচেতন যন্ত্ররূপে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কঠিন আঘাত হেনে, ভারতকে তার অতীত ঐতিহ্য এবং তার সমস্ত অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক করে দিল। শিল্পের কেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত করে, পূর্বতন বংশগত সম্পর্ক বা গৌরবের বদলে কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রচলন করে, ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকেই পাল্টে দিল ব্রিটিশ বুর্জোয়াসি।

আমার তো মনে হয়, এই হল বাংলার নবজাগরণের যথার্থ পশ্চাৎভূমি। এই ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রামমোহন দেখেছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া ভারতীয় সমাজের জাড্য ভাঙা সম্ভব নয়। বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর। জন স্টুয়ার্ট মিলের মূল 'সিসটেম অফ লজিক' সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য পুস্তক করেছিলেন তিনি। বোঝেন নি কে?

কিন্তু পরাধীনতার পাশে থেকে মন কী তৃপ্ত হয়? বরং নিজেদের গ্রহণ শক্তি দিয়ে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে বিচরণ করে মন শুধু অতৃপ্তিতেই ভরে ওঠে। পশ্চিমের এত আছে, আমাদের কী কিছুই নেই? রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, "হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে, সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে?"

এ-আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু যেখানে "আমরাই বা কীসে কম?" এ-ভাব এসেছে—সেখানেই হয়েছে মুস্কিল। পরাধীনতার অধীনে থেকে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকাহিনী অনেকের কাছে মহান বলে ঠেকেছে। ঠেকেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছেও। এবং চিরপ্রগতিশীল রবীন্দ্রনাথও অনেক সময় অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন। ভারতবর্ষের আত্মীকরণ শক্তিকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষ থেকে বিশ্বের ত্রাণকর্তার জন্ম হবে—এ বিশ্বাসকে প্রতিক্রিয়াশীল বলছি না। স্বদেশী যুগের হাওয়ায় তিনি যখন ভেসে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি "আমাদের সব ভালো, ইংরেজদের সব খারাপ" ধারণা পোষণ করেছেন। কিন্তু তাই চূড়ান্ত নয়। "উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাই নি", এ যেমন তাঁর স্বীকৃতি তেমনি বৃদ্ধ বয়সে মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে তিনি বলেছিলেন, "গদ গদ সেন্টিমেন্টালিস্‌ম্‌-এ ভারাক্রান্ত সে আবহাওয়া ক্রমে আবিল হয়ে উঠল, ধিক্কার এল মনে। সব বক্তৃতা দিতে উঠতেন—মাটি তো নয়, যেন মা'টি, কেঁদে ভাসায় আর কী। অসহ্য হয়ে উঠত আমার। কিছুতেই মিলতে পারলুম না। একটা সত্য আদর্শের দ্বারা চালিত, সুস্থ বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠ, সবল চরিত্র আমাদের দেশে একেবারে বিরল। সে সময়ে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল, যখন দেখলুম কত মৌখিক কত ব্যর্থ এসব গদগদ বক্তৃতা"—বস্তুত যে শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের হলো, সেই শিক্ষাই তাঁকে একদিন প্রাচ্যাভিমানের বিরুদ্ধে লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল—"অন্তরের গভীরতায় অনেকদিন থেকে আছে ইউরোপের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা, তার পরিবর্তে কোনো মূল্য না পাওয়াতেই একেবারে উল্টো দিকে দৌড় মেরেছে। বলে বসে, ওর

বিদ্যে ভালো না, বুদ্ধি ভালো না, চরিত্র ভালো না—আমাদের যা কিছু সবই ওদের চেয়ে অনেক ভালো। সাংখ্য দর্শন যখন সজীব ছিল তখন ওর মধ্য থেকে আমাদের চিত্ত প্রাণশক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু এখন ওর প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্র মাত্র হয়ে রয়েছে।" রবীন্দ্রনাথও একদিন উল্টো দিকে দৌড় মেরেছিলেন, কিন্তু সে এক বিশেষ পর্বে—দেশের ভাবালু আবহাওয়ায়। শেষ পর্যন্ত তিনি ওভাবে কোনো দিনই আর চিরন্তন আদর্শকে যুগোপযুগী, করে তোলার চেষ্টা করেন নি, বরং partisan রূপেই লিখেছেন "বর্তমান যুগে ইউরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। এই প্রভাবের প্রেরণায় ইউরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্ত জাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা! ইউরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়—তাকে স্বকীয় করে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সহিত্য, ইউরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাঙলা দেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা।" (সাহিত্যের পথে)

এত বড় কথা যে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, তা কী শুধু প্রলাপ? তাঁর পায়ের তলায় কি ছিল না শক্ত মাটি? ছিল। জার্মান সাহিত্যের যখন স্বর্ণযুগ, তখন—এঙ্গেল্স্ দেখিয়েছেন—জার্মানির অবস্থা "ছিল পূতিগন্ধময় ন্যক্কারজনক অবক্ষয়ী। কিন্তু তখনই জন্মেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন গ্যয়টে ও শীলার, ক্যাণ্ট ও ফিক্‌টে, এবং শেষতঃ হেগেল।" ভারতে যখন সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ছে, ধনতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে বিকৃতভাবে, একপেশে হয়ে—তখন সাহিত্যে শিল্পে যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বাঙালী মনের তাকে শুধুমাত্র পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের দ্বন্দ্ব বলা সঙ্গত নয়। এর ভিতরে রয়েছে পুরাতন সামন্ততন্ত্রীয় ছাপ এবং সঙ্গে সঙ্গে উদীয়মান ধনতন্ত্রীয় চিহ্ন। গ্যয়টে বা শীলারের নাটক কী আমরা অবক্ষয়ী সাহিত্য, সুতরাং উপযুক্ত ভিত্তিভূমি নেই, বলে উড়িয়ে দিতে পারি? তা কখনই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবেই উনিশ শতকের নবজাগরণ বিচারে আমাদের দেখতে হবে—বিকৃত ধনতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক ভাবে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা। তাই হবে যথার্থ নবজাগরণের চিত্র॥

একটি প্রস্তাব

শম্ভুনাথ দাস

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমাপ্ত প্রায়। এক বছর ধরে নানা গুণীজন নানা দিক থেকে কবি সম্বন্ধে নানাকথা বলেছেন। রবীন্দ্রচর্চার সূত্রপাত আগে থাকতে শুরু হলেও এই বছর কবি সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে কবির বাণী সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে পৌছেচে। আলোচনায় কবির বাণী নানাভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কবির উদ্ধৃতি সঠিকভাবেই হোক এটা সবারই কাম্য এবং একান্ত প্রয়োজন। কবির মুখে সামান্যতম শব্দের অপপ্রয়োগ অন্যায়। বিশেষতঃ যে সমস্ত ব্যক্তির উপর সমাজের লোকের আস্থা আছে, তাঁদের রচনায় এই ধরণের বিচ্যুতি নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। উদাহরণ-স্বরূপ বাঙলার অন্যতম বিদগ্ধ সমালোচক গোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' সংকলনটির কথা বর্তমানে আলোচ্য। এর মধ্যে চিন্মোহন সেহানবিশ-এর 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান রচনা আছে। কবির জীবনে আন্তর্জাতিক চিন্তার শুরু থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বিবর্তনের মাধ্যমে এর ক্রমবিবর্তন ধারার সঠিক পরিচয় সার্থকভাবেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু রচনাটির মধ্যে কবির মুখে এমন কতকগুলি শব্দ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যার সন্ধান আমরা কোথাও পায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত সাফল্য সম্বন্ধে কবির অন্তিম উক্তি "ওরাই পারবে, দানবকে ঠেকাতে পারবে।" (পৃঃ ২৩৬) চিন্মোহনবাবু বিশ্বভারতী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রশান্তবাবুর প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশান্তবাবুর উদ্ধৃতি নিম্নরূপ:

" "…রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] ছিল গভীর আস্থা"…যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা: "রাশিয়ার খবর বলো"। বললুম "একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে," মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।" " "(বি. ভা. ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৫০। পৃঃ ১৬৩) অর্থাৎ কবির মুখে "ওরাই পারবে" টুকুই আছে। এরপর "দানবকে ঠেকাতে পারবে" এই বাড়তি শব্দগুলো কেন চিন্মোহন বাবু বসিয়ে দিলেন?

নির্মলকুমারী মহলানবিশ তার 'বাইশে শ্রাবণ'-এ এই দিনের ঘটনা নিম্নরূপে বর্ণিত করেছেন।" "৩০শে জুলাই [১৯৪১]...আমরা ঘরে ঢুকে সামনে যেতেই বললেন "কিহে প্রশান্ত আজকের কাগজে যুদ্ধের খবরটা কি?" উনি বললেন—একটু যেন খবর ভালো। আজকের কাগজ পড়ে তো মনে হচ্ছে যে, রাশিয়ান সৈন্য জার্মানদের একটু ঠেকাতে পেরেছে। অত তাড়াতাড়ি আর এগোতে পারছে না। শুনে কবির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বললেন, "পারবে, পারবে, ওরাই পারবে। ভারি অহঙ্কার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং, গোয়েরিং এখন দেখুক গোয়েরিং কী হয়। দুশমনরা।"" (দেশ ১২ই মার্চ, ১৯৬০। পৃঃ ৪৫১।৫২)

ইলিয়া এরেনবুর্গের কাছে প্রশান্তবাবু কবির এই একই কথাই বলেছেন··· "I knew the Russians will stop them···" (On Tagore—Ilya Ehrenburg in In Homage to Tagore pp. 74)

দেখা যাচ্ছে কোথাও "দানবকে ঠেকাতে পারবে" কথাগুলো নেই। উদ্ধৃতি করার মধ্যে কবির মুখে এই ধরণের শব্দ বসানোর কারণ কি? চিন্মোহনবাবুর রচনাটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন হীরেন্দ্র মুখার্জি এবং সম্পাদনা করেছেন সুশোভন সরকার। এঁদেরও কি দৃষ্টি এদিকে পড়েনি?

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণ (১৯২৬) কবির জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা, এসম্বন্ধে আলোচনা খুবই কম। কবির ভ্রমণসঙ্গীরা এবং বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করে সেই অধ্যায়টি কিছুতেই জনসমক্ষে আনতে চান না। এই প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য আছে। তার আগে এই ভ্রমণকালে ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে কবিকে সচেতন করিয়ে দেন বিশ্বের অন্যতম শিল্পী রঁমা রঁলা। তাঁর একখানা চিঠি থেকে চিন্মোহনবাবু কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেটাও যথাযথ হয়নি এবং কোথা থেকে তিনি এটা সংগ্রহ করেছেন সেটাও ঠিক বুঝলাম না। চিন্মোহনবাবুর উদ্ধৃতি "···I am more solicitous of your glory than of your repose. I did not like it that the monsters should be able to abuse your name in history....The future will show you that I have acted as a vigilant and faithful guardian—"(pp. 226)।

রোঁলার চিঠিগুলি বিশ্বভারতী থেকে Rolland and Tagore বইতে

প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৫ সনে। এর আগে Alex Aronson তাঁর 'Rabindranath through western eyes' বই-এর মধ্যে ঐ চিঠিখানা নিজে অনুবাদ করে 'impublished letter' বলে প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৪৩ সনে। উদ্ধৃতিটি এইভাবেই পাওয়া যাচ্ছে···"However, I had no other interest in my mind but your glory, which I value more than your rest. I did not want devils misusing your sacred name in the annals of history···the future (the present already) will show you that I have acted as your faithful and vigilant guide." (Page no 67 of Rolland and Tagore, page 78 of Rabindranath through western eyes—by Alex Aronson এবং রবীন্দ্র জীবনী ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০৮)। চিন্মোহনবাবু উক্ত উদ্ধৃতি কোথায় পেলেন? 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি চিঠি পৃষ্ঠা ৪৫'-এর কোনো অর্থ বুঝলাম না। হীরেনবাবু চিন্মোহনবাবুর বই থেকে তাঁর 'Himself a true poem' বইতে এই ভুল উদ্ধৃতিটাই দিয়েছেন (দ্রঃ pp 121)। চিন্মোহনবাবুর রচনাটিও ইংরাজিতে পুস্তিকাকারে বেরিয়েছে; 'Tagore and the world' নামে। এই ধরণের ভুল উদ্ধৃতি কবি সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্তি আনবে। তাই আশা করি চিন্মোহনবাবু তথা সম্পাদক গোপাল হালদার মহাশয় এবিষয়ে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করে ভ্রম সংশোধনের ব্যবস্থা অবিলম্বে করবেন।

দুই

চিন্মোহনবাবুর রচনায় কবির ইতালী ভ্রমণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কবির আন্তর্জাতিক চিন্তার একটা মোড় এই ইতালী ভ্রমণকালেই ঘুরে যায়। ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে—রোঁমা রঁলার সহায়তায়—কবি প্রথম উপলব্ধি করেন। কিন্তু কবির সেই ভ্রমণকথা, সেই উৎকণ্ঠিত দিনগুলির বিবরণ এখনও কেন প্রকাশ করা হল না? এবিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া দরকার এবং বিশ্বভারতী তথা প্রশান্তবাবুর নীরবতা ভঙ্গ করার প্রয়োজন আছে।

নির্মলকুমারী মহলানবিশ-এর 'বাইশে শ্রাবন' থেকে জানতে পারি—"আমরা ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন য়ুরোপে ঘুরেছিলাম, তখন দেশে এবং বিদেশে কবিকে নিয়ে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইতালি গিয়েছিলেন বলে শুধু নয়, তিনি ইতালি থেকে বেরিয়ে গিয়ে

মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বলে। বিদেশে বিক্ষোভ হয়েছিল তিনি মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য, আর স্বদেশে বিরুদ্ধ সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল তিনি আতিথ্য ভোগ করার পরে মুসোলিনীর নিন্দা করে অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে।"

"আমার স্বামী জানতেন এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের গুরুত্ব কতখানি, তাই তিনি আর রথীবাবু—বিশ্বভারতীর যুগ্মকর্মসচিব—খুব পরিশ্রম হলেও প্রতিদিনকার বৃত্তান্ত যতটাসম্ভব ধরে রেখে প্রত্যেক সপ্তাহের ডাকে বিশ্বভারতীর বুলেটিনে ছাপাবার জন্তে দেশে পাঠিয়ে দিতেন। লিখতেন বেশীর ভাগই আমার স্বামী (অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) আর রথীবাবু টাইপ করতেন।"

"কিছুদিন পরে রথীবাবু শারীরিক কারণে কবির কাছ থেকে অনেকদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তখন আমরা দুজনে মিলে কত পরিশ্রম করে সেসব লেখা দেশে পাঠিয়েছিলাম তা কেন ছাপা হয়নি জানি না। বিশ্বভারতী পরিচালনার ভার তখন যাদের হাতে ছিল, একথার জবাব তারাই শুধু দিতে পারবেন। কিন্তু আমরা এক বছর পরে দেশে ফিরে শুনলাম, সে সব কাগজপত্র বিশ্বভারতীর আপিস ঘর থেকেই কোথায় হারিয়ে গেছে।"

"প্রশান্তচন্দ্র সে সব লেখার কোন কপি করে রাখার সময় পায়নি। ···আমি ঘুরতে ঘুরতে যে সব চিঠিপত্র সেই সময় আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে লিখেছিলাম আমার স্বামী সেগুলো সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে, তার উপর ভর করে আবার একটা ছবি দাঁড় করবার চেষ্টা করেছিলেন। তখনও তিনি বিশ্বভারতীর কর্মসচিব। তাই বিশ্বভারতীর আপিসের দেরাজের মধ্যেই এই গোছাকারে সাজানো আমার চিঠিপত্রের ফাইলটা রেখেছিলেন—সময় পেলে লেখাটা আরম্ভ করবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলেন সেই ফাইলটাও কোথায় অন্তর্ধান করেছে।···এই চিঠিগুলোও যে কেমন করে হারিয়ে গিয়েছিল সে একটা রহস্য।···হঠাৎ একদিন প্রবাসী খুলে দেখলাম তিনি [রবীন্দ্রনাথ] শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দুঃখ করে চিঠি লিখেছেন যে, ১৯২৬ সালে য়ুরোপে ভ্রমণ কালে যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘুরেছিলেন এবং স্বচক্ষে দেখেছিলেন······তারা এই বৃত্তান্তটা কোথাও প্রকাশ না করে কাউকে জানতে দিল না।···এর অল্পদিন পরেই রথীবাবু জানালেন যে বিশ্বভারতীর গুদামঘর থেকে বহু কাগজ-

পত্রের নিচে সেই টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্তটা পাওয়া গেছে।" (দেশ ১৩৬৬, পৃঃ ৯২১।৯২৩)

কবির European Tour-এর এই হল অবস্থা। কবির এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের গুরুত্ব প্রশান্তবাবু, রথীবাবু, নির্মলকুমারীদেবী সবাই উপলব্ধি করেছিলেন, যত্ন সহকারে প্রতিদিনকার বিবরণ টাইপ করে পাঠানোও হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্তও প্রকাশিত হল না কেন? প্রথমে এই "টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্ত" হারিয়ে যাওয়া, পরে নির্মলকুমারীর চিঠিপত্রের সাহায্যে লেখার চেষ্টা এবং সেই চিঠিগুলোও বিশ্বভারতীর আপিস থেকে অন্তর্ধান হওয়া, অবশেষে প্রশান্তবাবু জানাচ্ছেন "···২১০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে রয়েছি, একদিন টেলিফোনে অপরিচিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার কাছে লেখা কবির চিঠি আমার কাছে আছে। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি তা প্রকাশ করতে পারি'···পরে বরাহনগরে আমার কাগজপত্র খোঁজ করে দেখলুম যে আমার কাছে লেখা কবির অনেকগুলি চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে না।" (দেশ ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৬০)

এইসব দেখে মনে হয় এর পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে; এবং বিশ্বভারতীর কর্তাব্যক্তিরাই এর সঙ্গে জড়িত। প্রশান্তবাবু, নির্মলকুমারী এ বিষয়ে কেন কিছু লিখছেন না? তাঁরা শুধু বিভিন্ন চিঠিপত্র হারিয়ে যাওয়ার রহস্যজনক খবরই পরিবেশন করছেন। টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্তটা যখন পাওয়া গেল, তা এখনও প্রকাশিত হল না কেন? তাঁদের কি কোনো দায়িত্ব নেই?

আরও আশ্চর্যের বিষয় কবির সেই সময়কার ভ্রমণ বৃত্তান্ত যা অংশতঃ প্রকাশিত হয়েছে এবং কেউ কেউ সেই "টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্ত" থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন উদ্ধৃতির মধ্যে অসঙ্গতি এবং উদ্ধৃতি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার উল্লেখের মধ্যে মারাত্মক গোলমাল দেখা যায়। যেমন ১৯৪৩ সনে প্রকাশিত Alex Brown-এর 'Rabindranath through Western eyes' বইটিতে সেই সময়কার ঘটনার যে বিবরণ এবং উদ্ধৃতি আছে সেইগুলো সবই P. C. Mohalanabis-এর Notes থেকে নেওয়া। উক্ত বইয়ের ৭২ পাতায় "that Mussolini had saved Italy from utter ruin" উদ্ধৃতি নেওয়া "From a conversation between Rabindranath and Romain Rolland at Villenevve on .5th

June, 1926 ; as recorded by P. C. Mohalanobis." তারপর ৭৩ পাতায় "I have been told that this is what actually happened : Mussolini has succeeded in bringing back law and order for the people. Now they are prosperous……and I was told that all this was due to the forceful personality of Mussolini." (Ibid) ৭৫ পাতায় "While I had been talking to the Duce my guide and interpreter (Professor Formichi) got extremely nervous from time to time so that I did not get an opportunity of having a quiet talk with the Duce." (Ibid).

মাত্র দু বছর পরে ১৯৪৫ সনে—একই Alex Aronson, Krishna Kripalani-র যুগ্ম সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে 'Rolland and Tagore' নামে একখানা বই বেরোয় এবং সেখানে 25th June 1926-এর Conversationটায় কিছু শব্দের অদলবদল করা হয়েছে। যেমন law and order for the people-এর স্থলে to the people (P. 91 of Rolland and Tagore), I was told-এর স্থলে I was assured. (P. 91) আর ৭৫ পাতায় উদ্ধৃতিটা এইভাবে পাওয়া যাচ্ছে "while I had been talking with the Duke, from time to time he got extremely nervous so that I did ইত্যাদি (P. 91, 92)। সব থেকে আশ্চর্য Rolland and Tagore বইয়ের "conversation as reproduced here is taken from the records of Rabindranath Tagore's European Tours as preserved in the archives of the Rabindra Bhavan, Santiniketan. We do not know who took down the notes of these conversations at that time. They are obviously incomplete and seem to have been taken down rather hurriedly" (P. XVI).

একই Aronson 1943 সনে জানাচ্ছেন Conversation P. C. Mohalanobis-এর Notes থেকে নেওয়া কিন্তু 1945 সনে সম্পাদক হিসাবে Aronson জানেন না "who took down the notes of these conversations." নির্মলকুমারীর লেখা থেকে জানি প্রতিদিনকার বিবরণ টাইপ করে পাঠানো হত এবং "টাইপকরা বিদেশী ভ্রমণবৃত্তান্ত" "কাগজের গাদার নিচে পাওয়া গেছে" এবং কোনো কপি না রেখেই এই বিবরণ

তাঁরা পাঠিয়েছিলেন। Rolland-এর সঙ্গে Conversations-এর সময় ভ্রমণ-সঙ্গীরা ভিন্ন অন্য কেউ কি ছিল? প্রশান্তবাবু বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'কবিকথা'য় জানাচ্ছেন "১৯২৬ সালে মুসোলিনীর নিমন্ত্রণে ইটালিতে গিয়েছিলেন।…প্রথম ভিলনিভিউএ দেখা হল রোঁমা রোঁলার আর দুহামেলের সঙ্গে। পরে দেখা হল মাদাম সালভাডোরি (Madam Salvadori) মাদাম সালভামিনি (Madam Salvamini) আঞ্জেলিকা ব্যালব্যানফ (Angelica Balbanoff) এই রকম সব লোকের সঙ্গে যাঁরা ইটালি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কবি তখন অস্থির হয়ে উঠলেন যে, এখন কি করা যায়। ইটালি সম্বন্ধে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। আমরা সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না। বারবার লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো হচ্ছে না। আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। শরীর খারাপ হয়ে গেল। আমরা ওঁকে ভিলনিভিউ থেকে জুরিখ, সেখান থেকে ইনস্‌ব্রুক তারপর ভিয়েনা আর সেখান থেকে প্যারিস নিয়ে গেলাম।…তারপরে লেখাটা যখন শেষ করে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে পাঠিয়ে দিলেন তখন শান্ত হলেন।"… (পৃষ্ঠা ১৬১, ১৬২)

তাই এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক P. C. Mohalonobis-ই Conversation-এর Notes নিয়েছিলেন এবং "টাইপকরা বিদেশী ভ্রমণবৃত্তান্তে"র মধ্য থেকেই Aronson তার বই-এ কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তথা প্রশান্তবাবু জানাবেন কি হুবহুর বাদে এই ধরনের বিস্মৃতির পিছনে কোন্ শুভ উদ্দেশ্য আছে? আর টাইপকরা ভ্রমণবৃত্তান্ত "seem to have been taken down rather hurriedly" হয় কি করে? 'Rolland and Tagore' বই-এর conversations অংশের আরম্ভ যেমন হঠাৎ, শেষও তেমনি হঠাৎ। Hurriedly-র দোহাই দিয়ে বিশ্বভারতী কি Census করে কবির রচনা প্রচার করছেন? Aronson-এর বই-এ উদ্ধৃত P. C. Mohalonobis-এর notes-গুলো কোথায় গেল?

Rolland-এর ১১ই নভেম্বর ১৯২৬ সালের এক পত্রে জানতে পারি "Circumstances have forced us to devote a large part of our conversations to discussing contemporary and depressing subjects—that unfortunate Italy"…(Rolland and Tagore

P. 64) আবার রোঁলার সঙ্গে আলোচনাকালে "One topic which constantly recurred was the growth of international understanding and amity. Rolland who was much disturbed by the reports which had been broadcasted all over world about the poet's supposed change of view about Fascism, told him about seriousness of the situation." (Annual Report 1927-28. The President's tour in Europe 1926 V. B. d. April 1928) কিন্তু এই সময়কার দুটি conversation-এর মধ্যে একটায় "Unfortunate Italy" বা "Seriousness of the situation"-এর কোনো উল্লেখ নেই, অন্যটি হঠাৎ শুরু হঠাৎ শেষ। তাই "hurriedly"-এর দোহাই দিয়ে "large part of our conversation"-এর "large part" এবং "constanty recurred"-এর অংশটুকু census করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কী প্রকাশ করলেন ?

সবশেষে কবির বিবৃতিটি Manchester Guardian-এ প্রকাশিত হয়। সেটা প্রশান্তবাবু বলছেন অসুস্থ কবিকে প্যারিসে আনা হল, "তারপর লেখাটা শেষ করে Manchester Guardian-এ পাঠিয়ে দিলেন।" অর্থাৎ প্যারিস থেকেই লেখাটা পাঠানো হয়। "আমরা সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না। বারবার লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো হচ্ছে না।" Annual report-এ দেখি Switzerland-এ থাকার সময় "immediately started writing about his experiences in Italy in the form of a letter to a friend in India. Rolland however did not think that the above letter was an adequate condemnation of the Fascist movement and the poet decided to delay its publication." এর পর Austria অবস্থান কালে "He could not wait any longer and gave full expression to his sentiments in the form of a letter to C.F. Andrews which was sent to India. This letter was published in Manchester Guardian early in August 1926." (Vide V. B. d. 1928 April)

তা হলে চিঠিটা কোথা থেকে কোথায় পাঠানো হল। প্যারিস থেকে না অষ্ট্রিয়া থেকে ? সোজা Manchester Guardian-এ না to C.F. Andrews in India-তে ? প্রশান্তবাবু 'কবিকথা'য় বলছেন "ইটালি সম্বন্ধে আবার লিখতে আরম্ভ করেন" এবং "সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না।" এটা "in the form of a letter" না অন্য কোনো লেখা ?

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতবাবু জানাচ্ছেন "রঁলার নিকট হইতে তিনি ফ্যাসিস্ত ইতালির স্বরূপ জানিতে পারেন।······কিন্তু কবি তখনো খোলাখুলি ভাবে ইতালি সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না। ভারতে তাঁহার কোনো বন্ধুকে তিনি যে পত্র দেন তাহাতে অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বলেন তিনি মুসোলিনীর ব্যক্তিত্ব ও কর্মশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাহার কার্যকলাপ ভালো কি মন্দ সেবিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই।" ···এবং ১০ই জুলাই ভিয়েনা যান এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর "তিনি তাহার রুদ্ধমনের সমস্ত শক্তিদ্বারা ফ্যাসিজমকে ধিক্কার দিয়া এক দীর্ঘপত্র এনড্রুজকে লেখেন। সেই পত্রখানি অগষ্টমাসের গোড়ায় Manchester Guardian-এ প্রকাশিত হয়।" (৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৯২, ১৯৩)

C.F. Andrews-কে লিখিত পত্রের সংবাদই আমরা জানি কিন্তু প্রভাতবাবু কথিত "অত্যন্ত সাধারণভাবে লেখা" "ভারতে তাহার কোনো বন্ধুকে তিনি যে পত্র দেন", সেই চিঠিখানা কাকে লেখা এবং কোথাও কি প্রকাশিত হয়েছে ?

এই সমস্ত নানা কারণে কবির ইতালি ভ্রমণকে রহস্যজনক করে তুলেছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং কবির সেই সময়কার ভ্রমণসঙ্গীরা। "টাইপ করা বিদেশী ভ্রমণ বৃত্তান্ত" প্রকাশিত না হওয়ার পেছনে যে একটা গভীর চক্রান্ত আছে সেটা অনুমেয়। এটা প্রকাশিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কবি মৃত্যুর দু মাস আগেও বলেছেন "এখন তাঁদের এই সংগ্রহীত বিবরণের (European Tour) যথোচিত ব্যবহার হতে কোনো বাধা ঘটবে না" (২৪শে জুন '৪১)। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কি "বাধা" অপসারণ করে বিবরণটি প্রকাশ করবেন যাতে করে "যথোচিত ব্যবহার" করা সম্ভব হয় ?

রবীন্দ্রচর্চার পথে এই বাধাকে অপসারণ করার জন্য পরিচয়-এর সম্পাদকদ্বয় ও পাঠকগোষ্ঠীর কাছে আমার সবিনয় নিবেদন। এ বিষয়ে অবহিত হয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা কী অবলম্বন করা যায় চিন্তা করুন।

সংস্কৃতি সংবাদ

মুক্তির পথ

গোয়া মুক্ত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বুক থেকে ঔপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ চিহ্নের শেষ অবশেষটুকু এতদিনে লুপ্ত হল। আমাদের লজ্জা, আমাদের গ্লানির একটি স্মারক এতদিনে চূর্ণ হল। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি মহান পর্ব এতদিনে সমাপ্ত।

আজ স্মরণ করি সেই মহান দ্রষ্টাদের, যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্মরণ করি সেই বরণীয় যোদ্ধাদের, ত্যাগে ও সংগ্রামে যাঁরা ইতিহাস। স্মরণ করি দেশবাসীর বিপুল প্রাণশক্তিকে, ধ্রুবনক্ষত্রের মতো যা ইতিহাসকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করেছে। আর স্মরণ করি গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সেই শহীদ ও সৈনিকদের।

মাত্র কয়েকঘণ্টায় পাঞ্জিমের পতন হয়েছে। সালাজারের সীমাহীন ঔদ্ধত্য, অমানুষিক বর্বরতা ইতিহাসের রথচক্রে পলকে বিচূর্ণ হয়েছে। 'নাটো'চিহ্নিত অস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে পড়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের বৃহন্নলা অভিভাবক এই নাটোচক্র শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণই হতে পারে নি।

আর সালাজার গোঁসা করেছেন। পর্তুগালে খ্রীষ্টমাস উৎসব বাতিল হয়েছে। পশ্চিমী জগতের দিঙ্‌মণ্ডল হায় হায় রবে আচ্ছন্ন। বিশ্বস্ত জমিদারীর বশম্বদ নায়েব হঠাৎ বিদ্রোহ করেছে—ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইঙ্গমার্কিন মনোভাব যেন তাই। প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে এমনকি পশ্চিমী সাংবাদিকরাও লাঞ্ছিত, অপমানিত করেছেন। আর স্বস্তিপরিষদের অধিবেশনে ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে সোভিয়েত ভেটোতে। বড় দুঃখে পশ্চিমী গণতন্ত্র আজ আর্তনাদ তুলেছে পৃথিবীতে ন্যায়, অহিংসা, সম্প্রীতি আর রইল না। ইউ. এন. ওর অস্তিত্ব বিপন্ন। কারণ, গোয়া মুক্ত হয়েছে।

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত দেরিতে হলেও আজ গোয়ার ব্যাপারে

যে দৃঢ়তা দেখিয়েছে, আমরা তাকে অভিনন্দিত করি। ছদ্মবেশী গণতন্ত্রীর দল যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত ছদ্মবেশ উন্মুক্ত করে নির্লজ্জতা ও বর্বরতার কোন্ পর্যায়ে যেতে পারে—আর একবার সাম্রাজ্যবাদীচক্র তার প্রমাণ দিল। আর ঔপনিবেশিকতার অবসান, বিকশিত জীবন ও শান্তি—অগ্রগামী এই মানবসভ্যতার পক্ষে, বিপন্ন মানবিক মূল্যবোধের পক্ষে, যাবতীয় পশুশক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ়, অকুণ্ঠ, অতন্দ্র যে মহান্ দেশ ও জনগণ—পুনরপি এই সংকটকালে তাকেও বীরের বেশে দেখা গেল। আশ্চর্য যে জাতীয় অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত এতবড় ঘটনার সমর্থনে কলকাতার পথেঘাটে কোনো সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত পোস্টার পড়ে নি ; বাংলাদেশের জাতীয়তাবদী পত্রিকাগুলিতে কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ বিবৃতি প্রকাশিত হয় নি। সম্ভবত যে গোপন হস্ত এর উৎস, সে অধুনা সম্পূর্ণই আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাই জাতীয় ঘটনা তাকে বিচলিত করে না। কিংবা হয়তো সালাজারের মতো সেই অদৃশ্য হস্তও খ্রীষ্টমাসের উৎসব পরিত্যাগ করেছে অভিমানভরে। কারণ পশ্চিমী গণতন্ত্রের নাভিশ্বাসে তার হৃদয় বেদনার্ত হয়ে থাকবে। আর ভারতবর্ষের সমর্থনে চীনের দৃপ্ত বিবৃতি তাই একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য হয় নি।

প্রায় সমকালেই পর্তুগালে সালাজারবিরোধী অভ্যুত্থান নতুন ইতিহাসের যবনিকা উন্মোচন করল। আর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তিকংগ্রেসের অধিবেশনে বিভিন্ন দেশাগত শতশত প্রতিনিধি গোয়ার মুক্তিতে উল্লাস প্রকাশ করে, পৃথিবী থেকে উপনিবেশবাদ ও যুদ্ধভীতি দূর করার জন্য পুনরায় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যুদ্ধজোটের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। সম্মেলনে সালাজারবিরোধী অভ্যুত্থানের অন্যতম সৈনিক ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিকে আলিঙ্গন করে জানালেন—সালাজারই পর্তুগাল নয়।

গোয়া মুক্তির সমকালেই সোভিয়েত প্রেসিডেণ্ট ব্রেজনেভ ভারতবর্ষে। একটি প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী পত্রিকার ধারাবাহিক সোভিয়েত বিরোধিতা ও কোনো কোনো পরাভববাদীর সোভিয়েত বিরোধী বিবৃতি যে বাংলাদেশের মানসিকতার কোনো প্রতিনিধিত্ব করে না, তারও প্রমাণ দিয়েছেন কলকাতাবাসী নাগরিক। অপরিসীম আবেগে উদ্বুদ্ধ সেই দেশবাসী প্রেসিডেণ্ট ব্রেজনেভকে যে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

মুক্ত মানবতা, বিকাশমান সভ্যতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা ছিল এই সম্বর্ধনার প্রেরণা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জগতে

পশ্চিমী ষড়যন্ত্রে বিপন্ন ভারতবর্ষের সুহৃদ এই দেশটির প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতাও ছিল এক প্রত্যক্ষ কারণ। মুক্তি ও শান্তির আন্দোলনে প্রথমাবধি প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি দেশবাসীর এই অনুরাগ ও আস্থা আজ তাই পশ্চিমী জগতকে পুনরপি চিন্তিত করেছে। প্রতাপান্বিত ইঙ্গ-মার্কিন কণ্ঠে আবার নরম সুর বেরিয়েছে।

কিন্তু গোয়ার মুক্তি ও দেশবাসীর সোভিয়েত অনুরাগে ইতিহাসের যে অভিপ্রায় প্রকাশিত, শেষ পর্যন্ত তাকে ভিন্নমুখী করার সাধ্য কারোরই নেই। নানা জটিল ও অসমান পথ পরিক্রমা করতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মৈত্রীর পথই ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বকে পর্বান্তরে পৌছে দেবে।

বিয়োগপঞ্জী

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিচিত্র ও কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটেছে। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম পাদে সন্ত্রাসবাদী দলের অন্যতম নায়করূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু। 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনা ও বন্দীদশায় আদালতে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে অসহযোগ তাঁর কীর্তি। পরবর্তীকালে বিদেশে ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনার প্রয়াসেও তাঁর ছিল অগ্রগণ্য ভূমিকা। নানা রাজনৈতিক অভিযানের মধ্যে একসময়ে তিনি লেনিনের সংস্পর্শে আসেন।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্যত চিন্তানায়কের। এদেশে মার্কসবাদী ভাবধারা প্রচারে তাঁর অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় ভূমিকা বর্তমান। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ফ্যাসিবিরোধী, পরবর্তীকালের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীসংঘের তিনি ছিলেন এক অগ্রগণ্য ব্যক্তি। 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। অতুলনীয় কর্মশক্তির অধিকারী পণ্ডিতমহাশয় লোকচক্ষুর অন্তরালে জ্ঞান ও রসসাধনায় নিরত ছিলেন। সম্পূর্ণ মহাভারতের সটীক অনুবাদ, ধ্রুপদী সাহিত্যের সুষ্ঠ ভাষান্তর ও বহুবিধ মৌলিক রচনা দ্বারা তিনি বঙ্গ-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয়ের জীবনাবসান হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম-পরিচালনার বাইরে ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিও তিনি আগ্রহী ছিলেন। ছাত্রসমাজ সম্পর্কে তাঁর আন্তরিকতা বিষয়ে বহু অভিজ্ঞতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

চলচ্চিত্রপ্রসঙ্গ

পীপল্‌স্ সিনে সোসাইটি নামে নতুন একটি ফিল্ম সোসাইটি তৈরি হয়েছে। চেক কনস্থলেট প্রাঙ্গণে এঁদের উদ্যোগে 'বর্ন্ ইন নাইনটিনটুয়েন্টিওয়ান' দেখানো হল। ছবিটি চেক ও জার্মান যুগ্ম উদ্যোগে তোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী ক্ষয় আর বিনাশের মধ্যেও প্রেম এবং মানবিক মূল্যবোধের অনির্বাণতা এই চিত্রের বিষয়। এক ধরনের কবিত্ব ও সারল্যে মণ্ডিত এই চলচ্চিত্রটি বহুলাংশে মনকে স্পর্শ করে।

পীপল্‌স্ সিনে সোসাইটির ঘোষিত কর্মপ্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনকে ব্যাপ্ত ও মৃত্তিকাসংলগ্ন করার ব্রত এঁরা গ্রহণ করেছেন। একথা সত্য এখনও পর্যন্ত এই আন্দোলন মুখ্যত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীরও অগ্রগণ্য অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সর্বস্তরে সংরুচি ও উদ্দীপনার বিস্তার ব্যতীত আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব নয়। ভালো ছবি দেখানো, ছবির ভাষা বুঝতে সর্বতোমুখী সহায়তাই এই রুচিনির্মাণ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি হতে পারে। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রশিল্পের চাবিকাঠি আজও যাঁদের হাতে—তাঁরা দেশবাসীকে স্বভাবতই মধ্যযুগীয় মানসিকতার পাঁকে ডুবিয়ে রাখতে চাইবেন। তাই প্রয়োজন হল শহরতলীতে, মফঃস্বল শহরে, গাঁয়ে, কারখানায় সৎ ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। পীপল্‌স্ সিনে সোসাইটি এই দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন। বহু ক্ষেত্রে ব্যবসাভিত্তিকভাবে, কোথাও বা নিজস্ব উদ্যোগে এঁরা জনসাধারণকে দেশ-বিদেশের মহৎ চলচ্চিত্রাবলীর সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ করে দেবেন। অবশ্য পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সোসাইটি দুটিও ইতিপূর্বে এই দায়িত্ব অল্পাধিক পরিমাণে পালন করতে সচেষ্ট ছিলেন।

তাছাড়া কলকাতা শহরেও সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের ছবি

ব্যবসাগত ভিত্তিতে দেখানো হয় না। কিন্তু চেক, পোলিশ ও রুশ চলচ্চিত্র উৎসব এবং আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত পূর্ব জার্মানির ছবিটি দেখে আমরা তাদের এতদ্‌বিষয়ক আধিপত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছি। কলকাতায় সম্প্রতি প্রদর্শিত চাঞ্চল্যকর 'দি ট্রুথ' ও 'দি এ্যাপার্টমেন্ট' ছবি দুটির উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ এই দুটি ছবিকে যদি মোটামুটি পশ্চিমীজগতের প্রতিনিধিস্থানীয় গণ্য করা যায় তাহলেই বোঝা যাবে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রাবলীর তুলনায় এই পশ্চিমী ছবি কত মামুলি, ফিকে। অথচ এই ছবিগুলি আজও এদেশে সাধারণভাবে অল্প পরিচিত। সম্প্রতি সিনে ক্লাব আঁদ্রে ওয়াজ্‌দার বিশ্ববিখ্যাত 'কানাল' চিত্রটির ব্যবসাগত ভিত্তিতে প্রদর্শনের আয়োজন করে দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ফিল্ম সোসাইটিগুলি যদি এই দায়িত্ব আরো বেশি করে গ্রহণ করেন তাহলে চলচ্চিত্র আন্দোলন যথার্থই শক্তিশালী হবে। পীপলস সিনে সোসাইটিও এই অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন।

তাঁদের আরও একটি প্রশংসনীয় কর্মসূচীর কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সীনে টেকনিশিয়ান্‌স্‌, যাঁরা প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রাণ—এই শিল্পের নানাবিধ অব্যবস্থার জন্য আজও প্রায় সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় দিন কাটাচ্ছেন। আথিক অসাচ্ছল্যের দরুন ও সুব্যবস্থার অভাবে ভালো বিদেশী ছবি দেখার অভিজ্ঞতা এঁদের অনেকের নেই বললেই চলে। যদিও ফিল্ম সোসাইটি ও সিনে ক্লাবের সংবিধানে সীনে টেকনিশিয়ানদের জন্য স্বল্প চাঁদায় সভ্যপদের ব্যবস্থা আছে, তথাপি সেই সুযোগ তাঁরা সবিশেষ গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ দেশবাসীর মনে চলচ্চিত্রবিষয়ক উৎসাহ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির সভ্যগ্রহণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ফলে পূর্ণ চাঁদা দিয়েও অনেকে এই দুটি ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হতে পারছেন না। তাছাড়া সীনে টেকনিশিয়ানদের জন্য সভ্যসংখ্যা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদেরও বঞ্চিত হতে হচ্ছে।

পীপল্‌স্‌ সীনে সোসাইটি এই টেকনিশিয়ানদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সংক্ষক সভ্যপদ সংরক্ষিত রাখছেন বলে জানা গেছে।

তাছাড়া চলচ্চিত্রোৎসাহী যাঁরা এতদিনেও পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সোসাইটি দুটির সভ্যপদ পান নি, তাঁরাও এখানে সমবেত হতে পারবেন।

পীপল্‌স্‌ সীনে সোসাইটির এই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা যদি সুসম্ভব হয় তাহলে তাঁরা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রআন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবেন। এই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবে কার্যকরী হয় কিনা আমরা তা সাগ্রহে লক্ষ্য করব।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ও সীনে ক্লাব একই দায়িত্ব গ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যদি অগ্রসর হন, তবেই তা সম্ভব। কারণ এই ধরনের সংগঠনগুলির সম্পর্ক কখনই প্রতিযোগিতামূলক নয়, পরস্পরের পরিপূরক। ভরসা রাখি পীপল্‌স্‌ সীনে সোসাইটিও তা অনুক্ষণ মনে রাখবেন।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি সম্প্রতি নিও রিয়ালিস্ট স্কুলের অগ্রগণ্য পরিচালক ডি সিকার একটি চলচ্চিত্র উৎসব করলেন। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি উৎসবে ডি সিকার প্রদর্শিত চারটি ছবিই এদেশে ইতিপূর্বে ব্যবসাগত ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। অথচ ডি সিকার অন্য কয়েকটি ছবি আজও এদেশে প্রদর্শিতই হয় নি। তাই এই চলচ্চিত্র উৎসবে মন ভরে না। অবশ্য প্রতিটি ছবিই বারবার দেখা এক অভিজ্ঞতা।

সিনে ক্লাব দেখালেন ক্রেন্‌স্‌ আর ফ্লাইং। এই অসামান্য রুশ চলচ্চিত্রের পরিচালক হলেন কালাতোজভ।

একই সময়ে কলকাতায় রুশচলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বোন্দরচুকের 'ফেট অফ এ ম্যান' এবং কালাতোজভের 'দি আনসেণ্ট লেটার' আমরা দেখেছি। আর দেখেছি কিছু শর্টস্‌, যার মধ্যে মে দিবসের ডকুমেণ্টারি চিত্রটি দেখার অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। ফিল্ম সোসাইটিগুলির কাছে আমার বিনীত নিবেদন যেন তাঁরা এই ডকুমেণ্টারি চিত্রটি পুনঃপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

কালাতোজভকে বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠতম পরিচালকদের অন্যতম বলতে কারোরই দ্বিধা হবে না। 'দি আনসেণ্ট লেটার' ও 'দি ক্রেনস্‌ আর ফ্লাইং' দেখা বাস্তবিকই এক অভিজ্ঞতা। আর অবিস্মরণীয় শ্রীমতী সামাইলোভা—দুটি ছবিরই যিনি নায়িকা। 'দি আনসেণ্ট লেটার'-এর শেষাংশটি বাহুল্য। 'দি ক্রেন্‌স্‌ আর ফ্লাইং'-এর একদম শেষে বলাকার উপস্থাপনা খানিকটা যান্ত্রিকতাদোষে দুষ্ট। তা ছাড়া এ দুটি ছবির সাফল্য সীমাহীন। দুটি ছবিতেই ফোটোগ্রাফী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা যায়। চরিত্রের মানস-

প্রবাহ বর্ণনায় এই ফোটোগ্রাফী ও কম্পোজিশন পরিচালকের অসীম কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছে। দুটি ছবিতেই প্রেমের দৃশ্য কবিতা হয়ে গেছে।

'কানাল', 'এ্যাশেস এ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস্', 'দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং' এবং 'বর্ন্ ইন নাইন্টিনটুয়েন্টিওয়ান'—এই ছবিগুলি একটি প্রবন্ধের বিষয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে কিভাবে নাড়া দিয়েছে, বাস্তবতা ও কল্পনার সুষ্ঠ বিন্যাসে চলচ্চিত্র কিভাবে জীবনশিল্প হয়ে ওঠে—আশা করব যোগ্যতর সমালোচক সে বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করবেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিটলারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধী হোয়সিঙ্গারের প্রত্যার্পণের দাবি

১৯৪৩ সালের ৩০শে অক্টোবর মিত্রপক্ষীয় ঘোষণায় বলা হয়েছিল, জার্মান যুদ্ধাপরাধীরা যে-সব দেশে তাদের ঘৃণ্য অপরাধমূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত করেছে, সেই সেই দেশে তাদের বিচারের জন্যে ও শাস্তির জন্যে পাঠানো হবে।

১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তিতে এবং ১৯৪৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি ও ১৯৪৭ সালের ৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা এই ঘোষণা পুনরায় সমর্থিত হয়।

উক্ত চুক্তি ও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ঘোষিত হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ও ভূতপূর্ব জেনারেল এবং বর্তমানে 'নাটো'র সামরিক নেতা আডলফ হোয়সিঙ্গারকে বিচারের জন্যে সোভিয়েত সরকারের হাতে প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে গত ১২ই ডিসেম্বর সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট মার্কিন গভর্ণমেণ্টের কাছে এক নোট পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে মস্কোয় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সোভিয়েত মন্ত্রণালয়ের বার্তা বিভাগ সোভিয়েত ও বৈদেশিক সাংবাদিকদের ঐ নোটের ও আডল্ফ হোয়সিঙ্গারের অপরাধ সম্পর্কিত বহু দলিলের অনুলিপি দেন। বিগত ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতার সোভিয়েত কনসলেটে জেনারেলের

ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইংরেজী অনুবাদসহ উক্ত দলিলগুলির আলোক-চিত্রের এক প্রদর্শনী হয়। ঐ সব দলিল থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে হোয়সিঙ্গারের নেতৃত্বে তার অধীনস্থ বিভাগ 'বারবারোসা' 'সী লায়ন' 'শার্ক' 'অ্যাটিলা' 'মারিটা' 'টানেনবোম' নামে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইৎজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা রচনা করে। এবং হোয়সিঙ্গার তার বিভাগের প্রধান কর্তা হিসেবে এক নির্দেশনামা রচনা করে যে সাময়িকভাবে অধিকৃত এই সমস্ত দেশের এলাকাগুলিতে সন্ত্রাসের বিভীষিকা কায়েম করতে হবে, জনসাধারণের উপরে নির্মম নির্যাতন চালাতে হবে। শুধু ঐ দলিলগুলির ভিতর দিয়েই নয়, হোয়সিঙ্গারের ভূমিকাসংক্রান্ত বহু ঘটনা কার্যত প্রত্যক্ষ করাবার জন্যে হিটলারের দস্তাবেজখানা থেকে উদ্ধার করা একটি মূল চলচ্চিত্রও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদর্শিত হয়।

হোয়সিঙ্গার ছিল হিটলারের কুখ্যাত "ব্লিৎসক্রিগ"-এর এক পরম উৎসাহী সমর্থক। সোভিয়েত-এর উপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা রচনায় ও তাকে কার্যে পরিণত করার দিক থেকে সে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক উক্রাইন ও বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে নিশ্চিহ্ন করে দেবার হিটলারী পরিকল্পনা এই হোয়সিঙ্গারই পেশ করে। নাৎসীবাহিনীর দ্বারা সাময়িকভাবে অধিকৃত সোভিয়েত-এর এলাকাগুলির জনসাধারণের প্রতি বর্বরতম অত্যাচার চালাবার, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ধৃত সদস্যদের বিনাবিচারে গুলি করে হত্যা করার, প্রতিরোধ-আন্দোলনেরও গেরিলা-যোদ্ধাদের উপর নিষ্ঠুরতম অত্যাচার চালাবার প্রস্তাব ও নির্দেশ তারই। ১৯৪৩-৪৪ সালে কের্চ শহরে মুক্তি যোদ্ধাদের ও বেসামরিক নাগরিকদের বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয় হোয়সিঙ্গারের নির্দেশে। হিটলারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন এই হোয়সিঙ্গারকে হিটলারের পক্ষ থেকে নির্দেশ ও হুকুম দেবার অধিকারও দেয়া হয়েছিল।

নুরেমবুর্গ বিচারের সময়ে হোয়সিঙ্গার ছিল আমেরিকানদের হাতে। যদিও তখন তাকে যুদ্ধাপরাধে দায়ি করা হয়েছিল, কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে হোয়সিঙ্গারকে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কৃপাপুষ্ট এই ঘৃণ্যতম

যুদ্ধাপরাধীকে যখন অতলান্তিক সামরিক চুক্তিসংস্থার সর্বোচ্চ স্থায়ী সামরিক (পরিকল্পনা) কমিটির সভাপতি হিসেবে দেখতে পাই তখন বিশ্বশান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে আমেরিকান শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবেই একে গ্রহণ করা ছাড়া বিশ্বের শান্তি ও মুক্তিকামী জনগণের গত্যন্তর নেই।

সত্য গুপ্ত